ব্যঞ্জনা ও কাব্য

হরিহর মিশ্র

ব্যঞ্জনা কাব্য

হরিহর মিশ্র

(২য় খণ্ড)

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১১

প্রথম প্রকাশ

১লা আষাঢ়—১৩৬৪

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯

প্রচ্ছদ-পট

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণ-লিপি

চারু খাঁ

মুদ্রণ

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ঘোষ আর্ট প্রেস

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

পরিবেশক

গ্রন্থজগৎ

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

—দুই টাকা—

5269

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য
দেবকুমার বসু

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে [redacted]

ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'শব্দ ও তাহার শক্তি' বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখিয়াছি অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—এই শক্তি চতুষ্টয় যে অর্থগুলির প্রকাশ করে তাহারা যথাক্রমে অভিধেয়ার্থ, তাৎপর্য্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দার্থের সাহিত্যই কাব্য। সুতরাং কবিকর্মের স্বরূপ জানিতে হইলে শব্দার্থের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আলংকারিকদের পরিভাষায় ইহাকে ধ্বনি কাব্য বলা হয়। কাব্য ও অকাব্যের ভেদ রেখাটি টানিতে হইলে ব্যঞ্জনা শক্তিকেই তাহার নিয়ামক ধরিতে হইবে। অলঙ্কারবাদ ও রীতিবাদের মধ্যে ব্যঞ্জনার অস্পষ্ট অনুভূতি অস্ফুট স্বীকৃতিও থাকিলেও সেই সেই মতবাদের প্রবর্ত্তকগণ ব্যঞ্জনাশক্তির লীলাবৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত ছিলেন না। তাই পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলি কবিকৃতির যথার্থ স্বরূপ-নির্ণয়ে আংশিক সাফল্য লাভ করিলেরও তাহাদের মধ্যে কাব্যস্বরূপের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অভাব আছে। এগুলি কাব্য-লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে পারে নাই। ইহাদের নিকট তিনি পূর্ব্বের মতই রহস্যময়ী থাকিয়া গিয়াছেন। তাই কাব্য-সমীক্ষায় অধিকতর নিশ্চিত ও অভ্রান্ততর নিকষের আবিষ্কার অপেক্ষিত ছিল। আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্ত প্রবর্ত্তিত ধ্বনিবাদ সেই অভাব মোচন করিয়াছে। 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'—'ধ্বনি কাব্যের আত্মা' আনন্দবর্ধনের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে কাব্যতত্ত্বের যে সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার স্বরূপ-বিচার এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এই খণ্ডে বস্তু ও অলংকারধ্বনির প্রসংগ আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হইবে রসধ্বনি।

শ্রীহরিহর মিশ্র

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ,
ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর,
১লা আষাঢ়, ১৩৬৪

সূচীপত্র

১

'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ।'

—ধ্বন্যালোক—

—'ধ্বনি কাব্যের আত্মা।'

২

'কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন
কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাম্
নিদ্রয়া কলহেন বা॥'

—'সুধীগণের কাল কাটে কাব্যালোচনার আনন্দে। আর মূঢ়-ব্যক্তিগণ ব্যসন, নিদ্রা বা কলহে জীবন কাটাইয়া দেয়।'

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—লক্ষণামূলক ধ্বনি

কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে অলঙ্কারবাদ বা রীতিবাদের ব্যর্থতার কারণ এই যে, এ গুলি শব্দের বাচ্যার্থটিকেই নিজেদের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কাব্যের বাচ্যার্থ অথবা তাহার প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যের তীক্ষ্ণ আলোচনাই এই মতবাদগুলির স্বরূপ। বামন তাঁহার কাব্যালংকার-সূত্রের মধ্যে গুণের আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

'শব্দার্থ-গুণানাং বাচ্য-বাচক-দ্বারেণ ভেদং দর্শয়তি।'

—বাচ্য এবং বাচক দ্বারা শব্দগুন এবং অর্থগুণগুলির পার্থক্য দেখাইতেছেন।

যে গুণগুলি বাচক শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেগুলি শব্দগুন; আর যাহারা বাচ্য অর্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা অর্থগুণ বলিয়া কথিত হয়—ইহাই বামনের উক্তির অভিপ্রায়। দেখা যাইতেছে, এই সব আলঙ্কারিক তাঁহাদের কাব্যতত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে বাচ্যার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্যাকরণ বা অভিধান শব্দের যেটুকু অর্থ বলিয়া দেয় তাহার বাহিরে ইহাদের সমালোচনা-প্রতিভার স্ফূর্তি হয় নাই—অন্ততঃ সচেতন ভাবে তো নহেই। শব্দের যে অর্থটি নিতান্ত আটপৌরে এবং অনায়াসেই গ্রাহ্য তাহাকেই ইহারা একান্ত উপাদেয় মনে করিতেন। তদতিরিক্ত কোন অর্থ সম্পর্কে এই সব আলঙ্কারিক অবহিত ছিলেন না। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া কাব্যপুরুষের যাহা 'মুখের বাক্য' তাহাই তাঁহার 'অন্তরের কথা'রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল।

এই বাচ্যার্থবাদের সমস্ত ব্যাকুলতার অবসান ঘটাইয়া সাহিত্য-সমালোচনা-পদ্ধতি যেদিন ব্যঙ্গ্যার্থের সরণি অনুসরণ করিল সেটি কাব্য-সমীক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ধ্বন্যালোকের গ্রন্থকার প্রথমে বিদগ্ধ সমাজকে শোনান যে কাব্যের আত্মা অলংকার বা রীতি নহে, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'।

—কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি।

সাহিত্যের স্বরূপ বিচারে ইহা অপেক্ষা নিশ্চিততর, সার্বজনীন ও সার্বভৌম নিকষ আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। শব্দের যাহা বাচ্য অর্থ সেটি কাব্যের সার বস্তু নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের গ্রন্থের সহিত কবিকৃতির কোন পার্থক্যই থাকিত না; এবং একখানি অভিধানকে সম্বল করিয়াই যে কোন ব্যক্তি কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

কিন্তু তেমনটি যে ঘটে না তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে কথাটি বেশ স্পষ্ট করিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে।

'শব্দার্থ-শাসন-জ্ঞান-মাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্॥'

—কবিকর্মের সেই সারতম অর্থ কেবলমাত্র শব্দার্থের অনুশাসন জানা থাকিলেই জানা যায় না; যাঁহারা কাব্যার্থের তত্ত্বটি ভাল করিয়া জানেন তাঁহারাই কেবল সেটি বুঝিতে পারেন।

এই কারিকাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন লিখিয়াছেন,—

'যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচকস্বরূপ-পরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ। অথচ বাচ্যবাচকরূপ-লক্ষণকৃত-শ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থ-ভাবনা-বিমুখানাং স্বর-শ্রুত্যাদিলক্ষণমিব অপ্রগীতানাং গান্ধর্ব-লক্ষণবিদাম্ অগোচর এব অসৌ অর্থঃ।'

—যদি কাব্যার্থটি বাচ্যই হইত তাহা হইলে বাচ্য এবং বাচকের স্বরূপ জ্ঞান থাকিলেই তাহার প্রতীতি হইত। কিন্তু যাঁহারা কেবল বাচ্য এবং বাচকের লক্ষণ নির্ণয়ে পরিশ্রম করিয়াছেন অথচ কাব্য-তত্ত্বের ভাবনা বিষয়ে বিমুখ তাঁহাদের প্রকৃত কাব্যার্থের বোধ হয় না; যেমন যাঁহারা সঙ্গীতের লক্ষণ মাত্র জানেন অথচ গাহিতে জানেন না তাঁহাদের স্বরশ্রুতি প্রভৃতির ঠিক ঠিক অনুভূতি হয় না।

কেবল শাস্ত্র পড়া থাকিলেই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হয় না। যিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন মাত্র করিয়াছেন তাঁহার যেমন ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হয় না তেমনি মাত্র বাচ্যার্থ জ্ঞান যাঁহার

আছে তাঁহার নিকট কাব্যকলার প্রকৃত স্বরূপ যে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি তাহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। অবশ্য এ কথা হইতে এরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না যে, কাব্যের মধ্যে বাচ্যার্থের একেবারেই উপযোগিতা নাই। ইতিপূর্বে ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইয়া থাকে ; বাচ্যার্থরূপ বুনিয়াদের উপর ব্যঙ্গ্যার্থ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের মুখাপেক্ষী ; কিন্তু একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে ব্যঙ্গ্যই প্রধান হইয়া বাচ্যকে অভিভূত করিয়া দেয়। অন্ধকার গৃহে বস্তু দর্শন করিতে হইলে দীপশিখার যতটুকু প্রয়োজন, কাব্যে ধ্বনির প্রতীতির জন্য বাচ্য অর্থের প্রয়োজন তাহারই অনুরূপ।

'আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥'

—দর্শনার্থী ব্যক্তি যেমন দর্শনের উপায়রূপে দীপশিখাতে যত্নবান্ হন সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি যাঁহার আদর আছে তিনি তাহার উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থের প্রতি যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ কাব্যের আত্মা হইলেও বাচ্য অর্থের উপযোগিতা সেখানে নিরবকাশ হইয়া যাইতে পারে না। ধ্বনি একদিকে যেমন বাচ্যাতিরেকী অন্যদিকে তেমনি উহা বাচ্যাশ্রয়ী। যে বৃন্তটি পুষ্পকে বিধৃত করিয়া রাখে তাহা অপেক্ষা পুষ্প যেমন অধিক উপাদেয়, ঠিক অনুরূপভাবে যে বাচ্যবৃন্তে ধ্বনি-কুসুম ফোটে সেই বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বনিত অর্থটি অধিকতর উপাদেয় হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ধ্বনি কথাটির অলংকার শাস্ত্র সম্মত বিভিন্ন অর্থের একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। যাহা হইতে ধ্বনিত হয়—এইরূপ অর্থ ধরিলে ধ্বনি কথাটি বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থকে বুঝাইবে। কারণ ইতিপূর্বে শব্দশক্তিমূলক এবং অর্থশক্তিমূলক ব্যঞ্জনার আলোচনার কালে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন বাচক শব্দ বা বাচ্য অর্থ হইতে তাদৃশ ব্যঞ্জনার উল্লাস হইয়া থাকে। আবার

যাহার দ্বারা ধ্বনিত হয়—এইরূপ অর্থ ধরিলে ধ্বনি কথাটি ধ্বনন-ব্যাপারকে বুঝাইবে। ধ্বনি শব্দের এই অর্থটি বুঝাইবার জন্য ধ্বনন, দ্যোতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা ধ্বনিত হয় এইরূপ অর্থ ধরিলে ধ্বনি শব্দের দ্বারা ব্যঙ্গ্য অর্থকে বুঝিতে হইবে ; কারণ ব্যঙ্গ্য অর্থ ই বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা নিজেকে প্রকাশিত করে। সর্বশেষে যাহাতে ব্যঙ্গ্যার্থ ধ্বনিত হয় সেই কাব্যকেও ধ্বনি বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত তিনটি অর্থ বুঝাইতেই ধ্বনি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাহার মধ্যেও ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থ বুঝাইবার জন্য ধ্বনি কথাটির প্রয়োগ সমধিক। ধ্বন্যালোকের গ্রন্থকার যেখানে 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' বা 'ধ্বনিই কাব্যের আত্মা' এই কথাটি বলিয়াছেন সেখানে ধ্বনি শব্দের দ্বারা প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থটিকেই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থই যদি কাব্যের আত্মা হয় তাহা হইলে যেখানেই ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিবে তাহাই কি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? যদি তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত 'সূর্য অস্ত গিয়াছে' (১) এই বাক্যটিও উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া দাঁড়ায় ; কারণ এই বাক্যটি হইতে ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাসের কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে রচনায় বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর চমৎকারী তাহাই ধ্বনি-কাব্যের বিষয়। সুতরাং যে কোনরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের স্পর্শ মাত্রেই রচনা ধ্বনি কাব্য হইয়া উঠিতে পারে না। তাই ধ্বন্যালোক গ্রন্থে ধ্বনি কাব্যের লক্ষণে বলা হইয়াছে,—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ—কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

—যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজদিগকে অপ্রধান করিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থটিকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি-কাব্য বলিয়াছেন।

(১) প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য

বাচ্য অর্থ অথবা বাচক শব্দ নিজদিগকে অপ্রধানভাবে অন্তরালে রাখিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থটিকে যখন প্রধানভাবে দ্যোতিত করে তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদ্ভব হয়। এই বাচ্য বা ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য বা প্রাধান্যের নিয়ামক হইতেছে চারুত্বের তারতম্য। দুইটির মধ্যে যাহা অধিকতর চমৎকারী তাহাই প্রধান এবং অন্যটি অপ্রধান। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের মধ্যে একথাটি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

'চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্য-বিবক্ষা।'

—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে যে প্রাধান্যের কথা বলা হয় তাহার হেতু হইতেছে চারুত্বের উৎকর্ষ।

সুতরাং রচনার ব্যঙ্গ্য অর্থ যতক্ষণ না বাচ্য অর্থ অপেক্ষা চারুতর হইতেছে ততক্ষণ উহা ধ্বনি পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণের মধ্যে ধ্বনি-কাব্যের লক্ষণে বলিয়াছেন,—

'বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে
ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমম্।'

—ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিকতর চমৎকারী হইলে ধ্বনিকাব্য হয় এবং তাহাই উত্তম কাব্য।

এ প্রসঙ্গে আর একটি জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে, কোথাও ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক চমৎকারী হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার মাপকাঠি কি? যাহা একজনের নিকট চমৎকারী তাহা অন্যের নিকট চমৎকারী বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। আমি যে রচনাকে অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া মনে করি অপরে অনেকে হয়তো তাহা হেয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে কোন্‌টি হেয় এবং কোন্‌টি উপাদেয় তাহা সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারী কে?

আজকালকার দিনে গণতান্ত্রিক আদর্শ আমাদিগকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে নিছক সংখ্যা গরিষ্ঠতাকেই আমরা সর্বক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণের নিকষ বলিয়া মনে করি। বেশি লোকে যাহা অনুমোদন করে তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু সাহিত্যিক সত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই তথাকথিত গণমত যে একান্ত দুর্বল মানদণ্ড তাহাই প্রথমে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। কোন্‌টি সৎকাব্য এবং কোনটি অকাব্য তাহা যেদিন ভোটের দ্বারা নিরূপিত হইবে কাব্যবিচারের সেই দুর্দিন বিলম্বিত হউক ইহাই কামনা করি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচকগণ সমালোচনা পদ্ধতিতে এইরূপ একটি বিপত্তির আশঙ্কা করিয়াই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যবিচারের অধিকারী যে সকলেই নহে এই কথাটি তাঁহারা বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত বোদ্ধা—আলংকারিকদের পরিভাষায় 'সহৃদয়'—তাঁহারাই কেবল সৎকাব্য এবং অকাব্যের ভেদরেখাটি টানিতে পারেন। কবির হৃদ্‌গত ভাবটি নিঃশেষে তাঁহাদের নিকট নিবেদিত হয়। তাই ধ্বন্যালোকের গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

'তেন ব্রূমঃ সহৃদয়-মনঃ-প্রীতয়ে তৎস্বরূপম্'।

—অতএব সহৃদয়চিত্তের প্রীতির জন্য ধ্বনির স্বরূপটি বলিতেছি।

সহৃদয় কথাটির অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া অভিনব গুপ্ত তাঁহার লোচন-টীকায় লিখিয়াছেন,—

'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।'

—কাব্যানুশীলনের অভ্যাসহেতু চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হওয়ায় বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত যাঁহাদের তন্ময় হইয়া যাওয়ার যোগ্যতা আছে তাঁহারাই সহৃদয়; কবিহৃদয়ের সহিত তাঁহারা মিলন স্থাপিত করেন।

বস্তুতঃ কোন রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক চমৎকারী হইয়াছে কিনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার মত মার্জিত চিত্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সকলের থাকে না। সুতরাং এ প্রশ্নের চরম মীমাংসার ক্ষেত্র যে সহৃদয়-চিত্ত, ইহা আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কোন রচনা ধ্বনিকাব্য হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করিবার একমাত্র

অধিকারী সহৃদয় ব্যক্তি, পাঠক মাত্রেই নহেন।

এখন ধ্বনিকাব্যের বিভিন্ন প্রকারগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। ব্যঞ্জনা-শক্তির আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি (১) ব্যঞ্জনা কখনও লক্ষ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া এবং কখনও বা বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া প্রসারিত হইতে পারে। তদনুসারে ধ্বনি কাব্যকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—লক্ষণামূলক ধ্বনি এবং অভিধামূলক ধ্বনি। লক্ষণামূলক ধ্বনির অপর নাম অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি ; কারণ এখানে শব্দের বাচ্য অর্থটি বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। তাহা বাধিতস্বরূপ হইয়া বর্তমান থাকে, তৎসম্বন্ধ লক্ষ্যার্থ হইতেই ব্যঞ্জনার উল্লাস হয়। সেইজন্য এইরূপ ধ্বনির নাম দেওয়া হইয়াছে অবিবক্ষিত-বাচ্য। কিন্তু প্রশ্ন হইবে, বাচ্যার্থ অবিবক্ষিত বা বাধিতস্বরূপ একথার ঠিক অর্থ কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়, এই সব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ হয় নিজেকে কোন বিশেষ অর্থান্তরে পরিণত করে অথবা নিজেকে একেবারে অভিভূত করিয়া লুপ্তপ্রায় করিয়া দেয়! প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্যার্থের মধ্যে বাচ্যার্থের আংশিক অনুপ্রবেশ থাকে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহাও থাকে না। এই-দিক্ দিয়া দেখিলে অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে—অর্থান্তরে সংক্রমিত এবং অত্যন্ত তিরস্কৃত। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে।

অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'স্নিগ্ধ-শ্যামল-কান্তি-লিপ্ত-বিয়তো বেল্লদ্বলাকা ঘনা,
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদ-সুহৃদামানন্দ-কেকাঃ কলাঃ।
কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোর-হৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বং সহে
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হহা হা দেবি ধীরা ভব॥'

—মেঘমালা স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তির দ্বারা আকাশকে বিলিপ্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহাতে শব্দায়মান বকপংক্তি বিচরণ করিতেছে।

---

(১) প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য

জলকণা-সংপৃক্ত পবন প্রবাহিত হইতেছে; মেঘ-সুহৃৎ ময়ূরগণ হর্ষবশতঃ সুমধুর কেকাধ্বনি করিতেছে। ইহারা যথেচ্ছভাবেই থাকুক; আমি অত্যন্ত কঠোরহৃদয় রাম জীবিত আছি এবং সমস্ত সহ্য করিতেছি। কিন্তু বৈদেহী কি করিবে? হায় হায় দেবি; তুমি ধৈর্য ধারণ কর।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কবিতাটি সীতাবিরহ ব্যথিত রামের উক্তি। এস্থলে রাম শব্দটির বাচ্য অর্থ-মাত্র বিবক্ষিত নহে। কারণ তাহা গ্রহণ করিলে রামের মুখেই 'রামোহস্মি' বা 'আমি রাম বাঁচিয়া আছি' এইরূপ উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে। যিনি বক্তা তিনি যদি বলেন, 'আমি বাঁচিয়া আছি' তাহা হইলে সেইরূপ উক্তির সার্থকতা থাকে না। তাই এখানে রাম শব্দের বাচ্য অর্থটিকে অর্থান্তরে সংক্রমিত করিয়া বুঝিতে হইবে, এবং সেই অর্থান্তরের স্বরূপ দাঁড়াইবে —'ক্লেশসহিষ্ণু রাম।' এইটি এখানে রামশব্দের লক্ষ্যার্থ। এই লক্ষণা-লব্ধ অর্থ হইতে রামগত সহিষ্ণুতার আতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। যে রাম রাজ্য-নির্বাসন, জননীর কাতর ক্রন্দন, পিতার মৃত্যু, বনবাসজনিত সীতা-লক্ষ্মণের অশেষবিধ ক্লেশ ও অপমান, অনুরক্ত প্রজাবৃন্দের হাহাকার প্রভৃতি অসংখ্য দুঃখ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে সীতাবিরহ দুঃখ অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে; কারণ তাঁহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম। রাম শব্দ হইতে এতখানি অর্থ অভিধা বা লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত না। সুতরাং এটি ব্যঞ্জনা-লভ্য বুঝিতে হইবে। এই ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্য বা লক্ষ্যার্থ অপেক্ষা অধিকতর চারু হইয়াছে বলিয়া ইহা ধ্বনি-পদবীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; এবং যেহেতু রাম শব্দের বাচ্য অর্থটি শেষ পর্য্যন্ত অর্থান্তরে পরিণত হইয়া প্রতীত হইতেছে সেইজন্য এস্থলে ধ্বনিটি অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য।

ইহার আর একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

'তদা জায়ন্তে গুণা যদা তে সহৃদয়ৈর্গৃহ্যন্তে।
রবিকিরণানুগৃহীতানি ভবন্তি কমলানি কমলানি।'

—'সহৃদয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক যখন গৃহীত হয় তখন গুণগুলি গুণ হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণের দ্বারা অনুগৃহীত কমল কমল হয়।'

এই কবিতাটির মধ্যে দ্বিতীয় কমল শব্দটির মাত্র বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত নহে, কারণ তাহা গ্রহণ করিলে 'কমল কমল হয়'—এইরূপ বাক্যের অর্থসঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইভাবে অন্বয়ের বাধা হওয়াতে এখানে লক্ষণা অপরিহার্য্য হইয়াছে। সেই লক্ষণার বলে দ্বিতীয় কমল শব্দ শোভা-ভাজনত্বাদি বিবিধ ধর্মান্তরে পরিণত কমল পদার্থকে বুঝাইতেছে। এস্থলে লক্ষণা প্রয়োজন-মূলিকা; ধর্মান্তর গুলির আতিশয্য-ব্যঞ্জনাই সেই প্রয়োজন। সূর্য্যকিরণ স্পর্শে পদ্ম-পুষ্প নিরতিশয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে; তাহার উপচিত মকরন্দ ভ্রমরকে লুব্ধ করে; সৌরভে সর্বদিক্ আমোদিত হয়। কমলের ঈদৃশ বহুবিধ গুণের আতিশয্য-প্রতীতি ব্যঞ্জনা-লভ্য। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. দ্বিতীয় কমল শব্দটি লক্ষণাকে আশ্রয় করিয়াও তাহার বাচ্যার্থকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করে নাই; উহা কমল-মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল বিশিষ্ট কমলকে বুঝাইতেছে। সুতরাং উহার লক্ষ্যার্থের মধ্যে বাচ্যার্থেরও অনুপ্রবেশ রহিয়াছে। তাই এখানে ধ্বনিটিকে অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য বলা যাইতেছে। এ প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোকগ্রন্থে আনন্দবর্দ্ধনও এই কথাই বলিয়াছেন।

—'অনেন হি ব্যঙ্গ্যধর্মান্তর-পরিণতঃ সংজ্ঞী প্রত্যায্যতে, ন সংজ্ঞি-মাত্রম্।'

—'ব্যঞ্জনা-লভ্য অন্যান্য ধর্মের দ্বারা রূপান্তরিত পদার্থকে ইহার দ্বারা বোঝান হইয়াছে, কেবল মাত্র সেই পদার্থটিকেই নহে।

উক্তিটির আশয় এই যে, অভিধার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রাম এবং কমল শব্দের কেবলমাত্র বাচ্যার্থটির বোধ হইতেছে, লক্ষণার দ্বারা বিশিষ্ট রাম এবং বিশিষ্ট কমল পদার্থ প্রতীত হইতেছে এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের নিরতিশয় বিচিত্রতা ও আতিশয্য ধ্বনিত হই-তেছে। সুতরাং রাম বা কমল শব্দের আভিধানিক অর্থটিই এখানে কাব্যার্থ নহে; তাহারা ধর্মান্তরে পরিণত হইয়া যে অর্থগুলির অভি-

ব্যঞ্জনা করিতেছে তাহাই এখানে রচনার সারবস্তু।

এইবার বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলুঁ,
আজু মোর দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা॥'

এটি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে ভাবোল্লাসমগ্না রাধার উক্তি। কৃষ্ণচন্দ্রকে পাইয়া শ্রীরাধা তাঁহারগৃহকে গৃহ বলিয়া মনে করিলেন ; তাঁহার দেহও দেহ বলিয়া মনে হইল। আজ বিধি তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন —তাঁহার সমস্ত সংশয় মিটিয়া গিয়াছে। কবিতাটির বাচ্যার্থ এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, এখানে দ্বিতীয় 'গেহ' এবং 'দেহ' শব্দের মাত্র বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে অর্থের সঙ্গতি হয় না। 'গেহ-কে গেহ বলিয়া মানিলেন' অথবা 'দেহ দেহ হইল'— এইরূপ উক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা সেইভাবেই লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেই গৃহীতির মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা সার্থকতা নাই। শ্রীরাধা তাঁহার গৃহকে গৃহ ছাড়া আর কী-ই বা ভাবিতে পারিতেন ? তাঁহার দেহ দেহ ছাড়া আর কী-ই বা হইতে পারিত ? এইভাবে অন্বয়ের বাধা উপস্থিত হওয়ায় দ্বিতীয় গেহ এবং দেহ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিতে হয়—বিশিষ্ট গেহ এবং বিশিষ্ট দেহ। এখানে গৃহ এবং দেহের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহাদের পবিত্রতা, উপাদেয়তা, সফলতা ইত্যাদি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মগুলির আতিশয্য ও বিচিত্রতা ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধিত হইতেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের আগমনে শ্রীরাধিকার গৃহ এবং দেহ আজ নিরতিশয় পবিত্র, উপাদেয় এবং সফল হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে ; আজ জীবনকে তিনি নূতনরূপে দেখিতেছেন—এইরূপ একটি অর্থ কবিতাটি হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

এখানে ধ্বনিটিকে অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য এইজন্য বলা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গেহ এবং দেহ শব্দ তাহাদের বাচ্যার্থকে পরিপূর্ণ ভাবে ত্যাগ না করিয়া অর্থান্তরে পরিণত করিয়াছে ; তাহার পর তাদৃশ অর্থ হইতে ধ্বনিটির উল্লাস হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের স্পর্শমণি শীর্ষক কবিতা হইতে নিম্নে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। তাহাতেও অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি,
তাহার খানিক
মাগি আমি নতশিরে— এত বলি নদী-নীরে
ফেলিল মাণিক।'

সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীর নিঃস্পৃহ ত্যাগের নিকট যাচক ব্রাহ্মণের ধনাকাঙ্ক্ষার চরম পরাজয়ের কাহিনী কবিতাটিতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে সনাতন স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াও সেটিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে কাহাকেও দান করিয়া দিবার জন্য বালুকায় পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন আধ্যাত্মিক সম্পদের নিকট লৌকিক সম্পদ্ একান্তই তুচ্ছ। তাই যমুনার জলে স্পর্শমণি বিসর্জন করিয়া তিনি সনাতনের নিকট দিব্যজ্ঞান যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'মণিরে মান না মণি'—এই বাক্যের দ্বিতীয় মণি শব্দের বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থ সঙ্গতি হয় না ; মণিকে মণি ছাড়া আর কী-ই বা মনে করা যাইতে পারে ? অন্বয়বোধের এই বাধা অপসারণ করিবার জন্য এখানে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষণার ফলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াইবে—'মণিকে উপাদেয় মণি বলিয়া মনে কর না'। এই লক্ষ্যার্থ বোধের পর আবার ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা মণির নিরুপাদেয়তা ও তুচ্ছতার আতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে, এবং তাহাই এখানে কাব্যার্থ। জগতের সাধারণ মানব যে স্পর্শমণিকে পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সনাতন

তাহাকেই একান্ত হেয় বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অজ্ঞান ব্যক্তি অবস্তুকে বস্তু বলিয়া মনে করিয়া তাহার জন্য লালায়িত হয়; জ্ঞানীর দর্শন ইহার বিপরীত।

এখানে ধ্বনিটিকে অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য এইজন্য বলা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় মণিশব্দ তাহার বাচ্য অর্থটিকে পরিপূর্ণ ভাবে ত্যাগ না করিয়া অর্থান্তরে পরিণত করিয়াছে এবং তাহাকেই উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া ধ্বনিটি উল্লসিত হইতেছে।

এইবার লক্ষণামূলক ধ্বনির দ্বিতীয় ভেদ অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'রবিসংক্রান্ত-সৌভাগ্য স্তুষারাবৃত-মণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥'

—চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রান্ত হইয়াছে; উহার মণ্ডল তুষারের দ্বারা আবৃত। তাই চন্দ্র নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের মত প্রকাশ পাইতেছে না।

রামায়ণ হইতে এই কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চবটীতে হেমন্ত-বর্ণন প্রসঙ্গে রাম এই কথাগুলি বলিয়াছেন। এখানে 'অন্ধ' কথাটির মধ্যে অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনি আছে। অন্ধ শব্দটির বাচ্যার্থ হইতেছে দর্শন-শক্তি-রহিত। কিন্তু দর্শন শক্তির রাহিত্য কেবল চেতনের পক্ষেই সম্ভব। অচেতন দর্পণের অন্ধত্ব সম্ভবপর নহে। তাই অন্ধ শব্দ তাহার বাচ্য অর্থকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণার দ্বারা 'পদার্থ প্রকাশে অসমর্থ'—এইরূপ লক্ষ্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। তারপর সেই লক্ষ্য অর্থ হইতে ব্যঞ্জনার দ্বারা অসামর্থ্যের আতিশয্য, শোভাহীনতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মের দ্যোতনা হইতেছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্ধ শব্দ তাহার বাচ্য অর্থটিকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্যার্থের মধ্যে আংশিকভাবেও তাহার অনুপ্রবেশ নাই; সেইজন্য এস্থলে ধ্বনিটিকে অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য বলা হইয়াছে।

নিম্নে ইহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

'সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥'

—সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীকে তিনশ্রেণীর পুরুষ চয়ন করেন—বীর, বিদ্বান, এবং যিনি সেবা করিতে জানেন।

এখানে সুবর্ণপুষ্পা কথাটির বাচ্য অর্থ—যাহা সুবর্ণকে পুষ্পরূপে প্রসব করে। এই প্রসঙ্গে ঈদৃশ বাচ্য অর্থ বাধিত হইয়া যায়; কারণ পৃথিবীকে সুবর্ণপুষ্প প্রসব করিতে কেহ কখনও দেখেন নাই। সুতরাং মুখ্যার্থের দ্বারা অন্বয় অসম্ভব হইয়া পড়ায় লক্ষণার আশ্রয় লইতে হয়। সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণার দ্বারা সুবর্ণ-পুষ্পা কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—সুলভ সমৃদ্ধি-রাশির আকর। এটি প্রয়োজনমূলিকা লক্ষণা; পৃথিবীর অমিত সম্পদ্ যে বীর, বিদ্বান্ এবং সেবাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অত্যন্ত সহজ-লভ্য এবং সেইজন্য ঈদৃশ ব্যক্তিগণ যে প্রশংসার্হ তাহার ব্যঞ্জনাই এস্থলে লক্ষণার প্রয়োজন। এখানে লক্ষণার দ্বারা যে অর্থটি পাইতেছি তাহার মধ্যে—'সুবর্ণপুষ্পা' এই কথাটির বাচ্যার্থের কিছুমাত্র অনুপ্রবেশ নাই। অন্য কথায় বলা যায়, এখানে বাচ্যার্থটি অত্যন্ত তিরস্কৃত। তাই এইরূপ ধ্বনির নাম অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনি।

এই জাতীয় ধ্বনির পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতেও পাওয়া যাইবে।

'গগনং চ মত্তমেঘম্
ধারালুলিতার্জ্জুনানি চ বনানি।
নিরহঙ্কার-মৃগাঙ্কা
হরন্তি নীলা অপি নিশাঃ॥'

—আকাশ মত্তমেঘাবৃত, অরণ্যের অর্জ্জুন· বৃক্ষগুলি বর্ষণে কম্পিত, চন্দ্র নিরহঙ্কার, এবং রজনীগুলি কৃষ্ণা হইলেও চিত্ত হরণ করিতেছে।

এই কবিতাটির মধ্যে মেঘকে 'মত্ত' এবং চন্দ্রকে 'নিরহঙ্কার' বলা হইয়াছে। কিন্তু মত্ত এবং নিরহঙ্কার শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ

করিলে মেঘ ও চন্দ্রের সহিত তাহাদের অন্বয় হইতে পারে না। চেতনের ধর্ম অচেতনে বাধিত হইয়া যায়। মুখ্যার্থের এই বাধা নিরসনের জন্য লক্ষণা স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া মত্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ পাই—মত্ত সদৃশ বা পাগলের মত। এই লক্ষ্যার্থবোধের পর ব্যঞ্জনাশক্তির মহিমায় অসংযমকারিত্ব, দুর্নিবারত্ব, চঞ্চলত্ব প্রভৃতি বহু ধর্মের প্রতীতি শ্রোতৃ-চিত্তে উদ্‌ভাসিত হয়। বর্ষার কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ আকাশে পাগলের মত নৃত্য করে—উহা সেই রকমই অসংযত, দুর্নিবার এবং চঞ্চল ; অপরের সুখ দুঃখে উহার অপরিসীম ঔদাসীন্য। ঈদৃশ অর্থগুলি মত্তশব্দ হইতেই ব্যঞ্জনাশক্তির বলে প্রতীত হইতেছে। অনুরূপভাবে নিরহ-ঙ্কার শব্দেও সাদৃশ্য-সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া লক্ষ্যার্থ পাই—নিরহঙ্কারের মত। তারপর ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা নিষ্প্রভত্ব, মলিনত্ব, বিচ্ছায়ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মের প্রতীতি উল্লসিত হয়। নির্ম্মল আকাশে যে চন্দ্র পরম দ্যুতিমান্ হইয়া শোভা পান, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে তিনিই এখন একান্ত মলিন ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন ; পূর্ব্বের গৌরব তাঁহার আর নাই—এই অর্থটি এখানে ধ্বনিত হইতেছে।

এখন নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, মত্ত এবং নিরহঙ্কার শব্দ দুইটির যাহা বাচ্যার্থ তাহার কিছুমাত্র অনুপ্রবেশ লক্ষ্যার্থের মধ্যে নাই। লক্ষণার দ্বারা অভিধা অত্যন্ত তিরস্কৃত হই-য়াছে। অভিধা যে অর্থটিকে বুঝাইতেছিল লক্ষ্যার্থ তাহা হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে। তাই ধ্বনিটি এখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য।

এইবার রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এই জাতীয় ধ্বনির দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা'—কাব্যের 'দেবতার গ্রাস' শীর্ষক কবিতায় বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'কোথা তীর ! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি

ফেনিল আক্রোশে। একদিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।'

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কবিতাংশটির মধ্যে একসঙ্গে অনেক-গুলি অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে। অচেতন জল ক্ষিপ্ত বা উন্মত্ত হইতে পারে না; তাহার পক্ষে করতালি সহযোগে নৃত্য বা আক্রোশভরে গালি দেওয়া সম্ভবপর নহে; বারিরাশিকে লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, হিংস্র বা বিদ্রোহীও বলা যায় না। এক কথায় বলিতে হয়—এই স্থল গুলিতে চেতনের ধর্ম্ম অচেতনে বাধিত হইয়া যাই-তেছে। তাই বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণার আশ্রয় লইতে হয়। জোয়ারের জল আজ উন্মত্তের মত, লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র এবং বিদ্রোহীর মত আচরণ করিতেছে—এইরূপ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়ের আর কোন বাধা থাকে না। তারপর ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা জলরাশির অকস্মাৎ স্ফীতি ও চঞ্চলতা, প্লাবনের বিপুল কোলাহল, তরঙ্গমালার ভয়ঙ্কর সংঘাত, ফেনরাশির উৎক্ষেপ, দুর্ব্বার জলস্রোতের ধ্বংসলীলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বহু ধর্ম্মের আতিশয্য পাঠকের বা শ্রোতার চিত্তে ধ্বনিত হয়।

এই ধ্বনিগুলিকে অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য না বলিয়া উপায় নাই। কারণ এখানে ক্ষিপ্তোন্মত্ত প্রভৃতি শব্দের বাচ্য অর্থগুলিকে পরিপূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তোন্মত্তবৎ ইত্যাদি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে হই-য়াছে। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যার্থ গুলির মধ্যে বাচ্যার্থের অংশ মাত্রও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না; লক্ষ্যার্থ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্যার্থ যেন একেবারেই পলায়ন করিয়াছে। ইহাই বাচ্যার্থের অত্যন্ত তিরস্কৃতি। এইজন্য এইরূপ ধ্বনির নামও রাখা হইয়াছে অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনি।

ইহার আর একটি উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতেই দেওয়া

যাইতেছে। 'সোনার তরী'তে 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মধ্যে কন্যা-বিরহাতুর প্রবাসগামী পিতা শরতের অপরাহ্ণে পৃথিবীর যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।'

এই কবিতাংশটির মধ্যে কবি অচেতন পৃথিবীর উপর এমন কতকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন যাহারা কেবল চেতনের পক্ষেই সঙ্গতভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। ঔদাস্য চিত্তের ধর্ম্ম, তাহা জড় পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। তেমনি এলোচুলে বক্ষে হিরণ্য-অঞ্চল টানিয়া দিয়া স্থির নয়নে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন কোন রমণী ; বসুন্ধরার পক্ষে এই বিশেষণগুলির সার্থকতা নাই। তাই এগুলির বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে অন্বয় বাধিত হইয়া যায়। অন্বয়ের এই বাধার অপসারণের জন্য লক্ষণা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া আমরা অর্থ পাই—বসুন্ধরাকে আজ কোন উদাসীনা, আলুলায়িত-কুন্তলা, কনকাঞ্চলা, স্থিরনয়না নির্ব্বাক্ রমণীর ন্যায় মনে হইতেছে। তারপর ব্যঞ্জনা শক্তির মহিমায় নিখিল প্রকৃতির পরম স্তব্ধতা, তাহার অবারিত অজস্র সৌন্দর্য্যসম্ভার, জাহ্নবীর তীরে শরতের আসন্ন অপরাহ্নে অস্তগামী রবির স্বর্ণাভ কিরণরাশির ব্যাপ্তি ও সুখস্পর্শতা, পরিণত হরিদ্রাভ শস্যক্ষেত্রের দিগন্ত-বিস্তৃতি, নিশ্চিন্ত জীব-জগতে কর্ম্মচাঞ্চল্যের অভাব, গগনে ভুবনে নিরতিশয় স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তি - প্রভৃতি বহু বিচিত্র অর্থের দ্যোতনা শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে হইয়া থাকে। এই প্রতীতি-পরম্পরার যাহা সম্মিলিত ফল তাহাই এখানে কাব্যার্থ

বা ধ্বনি। বাচ্যার্থ এখানে অত্যন্ত তিরস্কৃত, কারণ উদাসী প্রভৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ সোজাসুজি পৃথিবীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। লক্ষ্যার্থও সীমাবদ্ধ, কারণ রমণীর সহিত সাদৃশ্যবোধনেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ অতি বিচিত্র; পাঠকের রুচি, সংস্কার ও প্রতিভার স্বচ্ছতাবশে উহা ক্রমবর্ধনশীল। সেই দিক্ দিয়া বিচার করিলে উহাকে অপরিমেয় বলা যাইতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সামগ্রিক ধ্বনির কথা এখানে বিচার করা হইতেছে না। তাহা গভীরতর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কবিতার ঠিক এই অংশটিতে যে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি আছে তাহাই এখানে আলোচিত হইল।

এমনি করিয়া প্রয়োজন-মূলিকা লক্ষণার স্থলগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই সেই বাচ্যার্থটি হয় অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়া অথবা অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়া প্রতীত হইতেছে। তদনুসারে লক্ষণামূলক ধ্বনিরও দুইটি ভাগ স্বীকার করা হইয়াছে—অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনি এবং অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য ধ্বনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিধামূলক ধ্বনি—১ শব্দশক্তিমূলক

এ পর্যন্ত আমরা লক্ষণামূলক ধ্বনি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এইবার অভিধামূলক ধ্বনির স্বরূপটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। যেখানে অভিধেয় বা মুখ্য অর্থ হইতে অব্যবহিত ভাবে ব্যঙ্গ্যার্থের দ্যোতনা হয় সেখানে ধ্বনিটি অভিধামূলক বুঝিতে হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, পূর্বোক্ত লক্ষণামূলক ধ্বনির স্থলে শব্দের চারিটি ব্যাপার ক্রিয়াশীল থাকে—অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। প্রথমে অভিধা শক্তির দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থটি উপস্থাপিত হয়। তারপর তাৎপর্য শক্তির বশে অন্বয়ের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু অন্বয় করিতে গিয়ে দেখা যায় যে, যোগ্যতার অভাবে অর্থগুলি বাধিত হইয়া যাইতেছে। তখন লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। তারপর চতুর্থ স্তরে আমরা পাই ব্যঙ্গ্যর্থটিকে। সুতরাং সমস্ত লক্ষণা-মূলক ধ্বনির ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে একটি ব্যবধান থাকে এবং সেই ব্যবধানটি হইতেছে লক্ষ্যার্থ। কিন্তু অভিধামূলক ধ্বনির স্থলে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এখানে শব্দ-ব্যাপারের তিনটি স্তর বর্তমান থাকে—অভিধা, তাৎপর্য এবং ব্যঞ্জনা। অভিধাশক্তির দ্বারা মুখ্যার্থের উপস্থিতি, তাৎপর্যের দ্বারা অন্বয় এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইয়া থাকে। এই অভিধামূলক ধ্বনির অপর নাম হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি ; এখানে বাচ্যটি বক্তার বিবক্ষিত হইলেও উহা অন্য-পর অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য-নিষ্ঠ হইয়াই প্রতীত হয়। শেষ পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ্যার্থই প্রধান থাকে, বাচ্যার্থ তাহার সহায়করূপে সর্বদা অনুগমন করে। প্রদীপ যেমন বস্তুনিচয়ের প্রকাশকালেও নিজে অন্তর্হিত হয় না, বাচ্যার্থও তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশকালেও বর্তমান থাকে। কোন অবস্থাতেই উহা নিজেকে অত্যন্ত তিরস্কৃত করিয়া ফেলে না। তাই বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণের মধ্যে বলিয়াছেন,—

'অত্র হি বাচ্যোঽর্থঃ স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব ব্যঙ্গ্যার্থস্য প্রকাশকঃ। যথা প্রদীপো ঘটস্য।'

'এখানে (অভিধামূলকধ্বনি স্থলে) বাচ্য অর্থ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে করিতেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয় ; যেমন প্রদীপ ঘটের।'

এই অভিধামূলক ধ্বনি প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সংলক্ষ্য-ক্রম-ব্যঙ্গ্য এবং অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইয়া থাকে। প্রথমে বাচ্যার্থের বোধ হইয়া গেলে তাহার পরে প্রকরণাদির বৈশিষ্ট্য হেতু ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়। সুতরাং বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ বোধের একটি ক্রম আছে সত্য। কিন্তু সেই ক্রম বা পৌর্বাপর্যটুকু কোথাও বোধের বিষয় হয়, আবার কোথাও বা হয় না। যে ধ্বনিতে বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের ক্রম সম্যক্‌রূপে লক্ষিত হয় তাহা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। আর যেখানে তাহা হয় না তাহা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি বলিয়া অভিহিত হয়।

সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির আবার তিনটি ভেদ আছে—শব্দশক্তি-মূলক, অর্থশক্তিমূলক এবং উভয়শক্তিমূলক। যেখানে শব্দটিকে পরি-বর্তন করিয়া দিলে ব্যঙ্গ্যার্থটি টিকে না সেখানে ধ্বনি শব্দশক্তিমূলক। আবার যেখানে শব্দপরিবৃত্তি সত্ত্বেও ধ্বনিত অর্থটি অটুট থাকে সেখানে ধ্বনি অর্থশক্তিমূলক। কোন রচনাতে এই উভয়বিধ ধ্বনি মিলিত হইলে তাহা উভয়শক্তিমূলক ধ্বনির উদাহরণস্থল হইবে।

পূর্বোক্ত শব্দশক্তিমূলক ধ্বনির স্থলে ধ্বনিত অর্থটি বস্তু এবং অলঙ্কার ভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। রচনার মধ্যে কোন বিশিষ্ট শব্দকে আশ্রয় করিয়া ব্যঞ্জনাশক্তি যদি বস্তু বা ঘটনামাত্রকে বুঝায় তবে তাহা শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির স্থল। আবার এইরূপস্থলে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা যদি কোন অলংকারের প্রতীতি হয় তবে তাহা অলংকার ধ্বনি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে।

শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি

গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'পথিক! নাত্র সংস্তরমস্তি মনাক্ প্রস্তরস্থলে গ্রামে।
উন্নতপয়োধরং প্রেক্ষ্য যদি পুনর্বসসি তদ্ বস ॥'

'হে পথিক! এই গ্রামটি প্রস্তরময়; এখানে একখানিও মাদুর নাই। তবে মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া যদি থাকিতে চাও তাহা হইলে থাক।'

শ্রাবণসন্ধ্যায় গৃহাগত নবীন পথিককে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগের সঞ্চার হওয়াতে কোন তরুণী নায়িকা এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। স্থানটি যে বাসের অযোগ্য তাহাই প্রথমে নায়িকা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। একে মৃত্তিকা প্রস্তরবহুল, তাহার উপর শয্যার সামান্যতম উপকরণেরও একান্ত অভাব। এত ক্লেশের মধ্যে নায়িকা আশ্রয়প্রার্থী পথিকটিকে থাকিয়া যাইবার উপদেশ দিতে পারেন না। তবে আকাশে বর্ষুক মেঘ উঠিয়াছে; সেদিক্ বিবেচনা করিয়া যদি পথিক নিজে থাকিয়া যাইতে চাহে তাহা হইলে থাকিতে পারে। নায়িকার উক্তির বাচ্য অর্থ এতদতিরিক্ত অন্য কিছু নহে।

কিন্তু আপাতদৃষ্ট এই বাচ্যার্থ কতকগুলি শব্দকে অবলম্বন করিয়া একটি অর্থান্তরের দ্যোতনা করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে, উপরিনিবদ্ধ কবিতাটির মূল প্রাকৃত ভাষায় রচিত। যে প্রাকৃত শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ সংস্তর (মাদুর) বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে সেটি হইতেছে 'সত্থর'। প্রাকৃত সত্থর কথাটির সংস্কৃত প্রতিশব্দান্তর হইতেছে 'শাস্ত্র'। প্রস্তর কথাটি হইতে একান্ত জড়বুদ্ধি মূর্খ এইরূপ অর্থও আসিতে পারে। সর্বশেষে উন্নত পয়োধর কথাটির অর্থান্তর হইতে পারে উচ্চস্তন। এই শব্দগুলিকে অবলম্বন করিয়া বক্ত্রী, বোদ্ধব্য ও কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হেতু বাচ্যার্থের অন্তরালে যে অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা হইতে পারে তাহা নিম্নরূপ,—

'হে পথিক! এ গ্রামে সকলেই মূর্খ; কামশাস্ত্রে তাহাদের অল্পমাত্রও জ্ঞান নাই। তবে উচ্চস্তন দেখিয়া যদি বাস করিতে চাও তাহা হইলে কর।'

নায়িকা প্রতিবেশী তরুণদিগকে মূর্খই বলিতে চাহেন। ললিত-কলায় যদি কিছুমাত্রও জ্ঞান তাহাদের থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইঙ্গিতজ্ঞ ও ঔচিত্য-বোধ-সম্পন্ন হইত। একটি নিতান্ত রাগরক্ত হৃদয়ের মর্ম্মকথা যাহারা বুঝিল না তাহাদিগকে জড়বুদ্ধ ছাড়া কী বলা যাইতে পারে? সুতরাং চতুর পথিক যদি উপভোগক্ষম হন তাহা হইলে থাকিয়া যাইতে পারেন।

দেখা যাইতেছে, নায়িকার উক্তির বাচ্যার্থের অন্তরালে যে অর্থান্তরটির দ্যোতনা হইতেছে তাহার স্বরূপ বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্ন। বাচ্যার্থের মধ্যে ঔদাসীন্য প্রকট হইলেও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে পথিককে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 'তুমি থাকিয়া যাও'—এই বস্তুটি এখানে ব্যঙ্গ্য; এবং এই ব্যঙ্গ্যার্থটি কতকগুলি শব্দকে আশ্রয় করিয়া উল্লসিত হইতেছে বলিয়া ইহা শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

জগন্নাথ তাঁহার রসগঙ্গাধর গ্রন্থে শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির যে উদাহরণটি দিয়াছেন তাহাও নিম্নে নিবদ্ধ করা যাইতেছে।

'রাজ্ঞো মৎপ্রতিকূলান্মে মহদ্‌ভয়মুপস্থিতম্।
বালে বারয় পান্থস্য বাসদান-বিধানতঃ॥'

—'হে বালে, আমি পথিক; রাজা প্রতিকূল হওয়াতে আমার মহান্ ভয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি আমার আশ্রয়দান বিধান করিয়া তাহা বারণ কর।'

কোন তরুণী নায়িকাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগের উদ্রেক হওয়াতে নায়ক এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। একে তিনি প্রোষিত, তাহার উপর রাজভীত। সুতরাং বালার নিকট তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। কবিতাটির বাচ্য অর্থ এই পর্যন্ত। কিন্তু আপাতদৃশ্যমান এই বাচ্যার্থের অন্তরালে একটি অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা হইতেছে। রাজা কথাটির একটি অর্থ যেমন 'নৃপতি' তাহার অন্য একটি অর্থ হইতেছে 'চন্দ্র'। বাসদান কথাটির এক অর্থ 'বাসের দান' এবং উহার অর্থান্তর হইতে পারে 'বাস' এবং 'দান'। এই

শব্দগুলির আনুকূল্যে যে অর্থান্তরটির দ্যোতনা হইতেছে তাহা এইরূপ,—

'হে তরুণী! আমি প্রোষিত; চন্দ্র আমার প্রতিকূল হওয়াতে আমার বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আশ্রয় এবং দান বিধান করিয়া সেই ভয় নিবারণ কর।'

একে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, তাহার উপর নায়ক প্রোষিত। গৃহে থাকিলে তাঁহার এত ক্লেশ হইত না। আকাশের চাঁদ আবার সেই ক্লেশকে বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছে। চাঁদকে দেখিয়াই তাঁহার ভয় হইতেছে। নবীনা নায়িকা ইচ্ছা করিলে এই বিষম বিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন—কেবল আশ্রয় দান করিয়া নহে; হৃদয় দান করিয়াও। বালার নিকট পথিকের এই প্রার্থনারূপ বস্তুই কবিতাটির ব্যঙ্গ্যার্থ; এবং উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটি শব্দ-বিশেষের আনুকূল্যে উল্লসিত হওয়াতে এখানে শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনি পাওয়া যাইতেছে। রাজা কথাটির প্রয়োগ না করিয়া তাহার সমানার্থক অন্য শব্দের প্রয়োগ করিলে ব্যঙ্গ্যার্থ টিকে না। সুতরাং উহা বিশিষ্ট শব্দের উপর নির্ভরশীল—অর্থের উপর নহে। অন্য কথায় বলা যায়, এখানে ব্যঙ্গ্যার্থটি শব্দ-পরিবৃত্তিসহ নহে। পূর্ব উদাহরণেও 'উন্নত-পয়োধর' কথাটির প্রয়োগ না করিয়া তদর্থক 'উচ্চমেঘ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে ব্যঙ্গ্যার্থের বিলুপ্তি হয়। দেখা যাইতেছে, ঈদৃশ সমস্তস্থলেই শব্দবিশেষ ব্যঙ্গ্যার্থের উপজীব্য। তাই এই জাতীয় ধ্বনিগুলিকে শব্দশক্তিমূলক বলা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি যে শ্লেষ অলঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না সে প্রসঙ্গের আলোচনা আগেই আমরা করিয়াছি। যখন প্রকরণাদির দ্বারা অভিধা একটি মাত্র অর্থে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মুক্ত থাকে তখন শব্দ-বিশেষের একাধিক বাচ্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে এবং তাদৃশ স্থল শ্লেষ অলঙ্কারের এলাকার মধ্যে আসে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে প্রকরণাদির বশে অভিধাশক্তি একটি মাত্র বাচ্য অর্থে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেলেও বক্তা, বোদ্ধব্য, দেশ, কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-হেতু অর্থা-

স্তরের প্রতীতি হয় সেইগুলি সমস্তই শব্দশক্তিমূলক ধ্বনির স্থল বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাব্দী ব্যঞ্জনার আলোচনা কালে আমরা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির উদাহরণ দুইটি কেন শ্লেষ অলঙ্কারের বিষয় হইবে না এইরূপ আশঙ্কার কোন অবকাশ নাই।

এ পর্যন্ত আমরা শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছি। এইবার শব্দশক্তিমূলক অলঙ্কার ধ্বনির স্বরূপটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

নিম্নে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা শব্দশক্তিমূলক ব্যতিরেক-অলঙ্কার ধ্বনির স্থল।

'নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥'

—'চন্দ্রকলা-শোভিত সেই ত্রিশূলধারীকে নমস্কার করি— যিনি উপকরণসম্ভার ব্যতীতই শূন্যে বিচিত্র জগৎ বিস্তার করেন।'

মহাদেবের স্তুতিবাক্যরূপে কবিতাটি রচিত হইয়াছে। তাঁহার অপরিসীম মহিমার বর্ণনাই কবির অভিপ্রায়। যদিও উপাদান-সম্ভার ব্যতীত সৃষ্টিব্যাপার অসম্ভব তথাপি তাহাও ভগবৎ ইচ্ছার আয়ত্ত বলিয়া ভগবৎসৃষ্টিকে উপাদান-নিরপেক্ষ বলা হইয়াছে। কবিতাটির বাচ্যার্থ এই পর্যন্তই। কিন্তু নিপুণভাবে অনুধাবন করিলে এই বাচ্যার্থের অন্তরালে একটি উক্তি বৈচিত্র্যের দ্যোতনা প্রতীত হইবে। কবিতাটির মধ্যে চিত্র এবং কলা এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ আছে। উহাদের যে অর্থ উপরের ব্যাখ্যায় গৃহীত হইয়াছে তাহা ছাড়াও অর্থান্তর আছে। চিত্রশব্দের দ্বারা আলেখ্য এবং কলা শব্দের দ্বারা ললিত কলাও বোধিত হইতে পারে। চিত্রকর যখন আলেখ্য রচনা করিতে চাহেন তখন তাঁহার রং তুলিকাদি উপকরণ এবং বস্ত্রাদি আধারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মহাদেব এমনই কুশল শিল্পী যে সৃষ্টি-কর্ম্মে উপকরণ বা আধার কিছুরই অপেক্ষা তিনি রাখেন না। এখানে মর্ত্যের চিত্রকর অপেক্ষা এই মহাশিল্পীর রচনা-কৌশলের

তৃতীয় অধ্যায়

অভিধামূলক ধ্বনি—২ অর্থশক্তিমূলক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা শব্দশক্তিমূলক ধ্বনির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইবার অর্থশক্তিমূলক ধ্বনির স্বরূপটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। ইহার বিষয়টি পূর্বাপেক্ষা বিপুলতর। বহু বিচিত্রভাবে বাচ্য অর্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের উল্লাস হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাচ্যার্থকে প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—স্বতঃসম্ভবী, কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ। যে সমস্ত অর্থ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অনুভবসিদ্ধ—যাহাদের সহিত বাস্তব জগতের কোন বিরোধ নাই সেইগুলিকে স্বতঃসম্ভবী বলা যাইতে পারে। স্বতঃসম্ভবী না বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ বলিলে বোধ হয় কথাটি আরও সহজবোধ্য হয়। বাহ্য জগতে প্রকৃতির যে বিচিত্র রূপ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা স্বতঃসিদ্ধ। নদী-কান্তার-শোভিত ধরিত্রীর বর্ণনা যখন আমরা কাব্যে পাঠ করি তখন তাহার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য বাদানুবাদ বা মতদ্বৈধের অবকাশ থাকে না কারণ সেইরূপ অর্থ আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া আছে। তাই মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের মধ্যে বলিয়াছেন,—

> 'স্বতঃসম্ভবী ন কেবলং ভণিতিমাত্রনিষ্পন্নো যাবদ্
> বহিরপি ঔচিত্যেন সংভাব্যমানঃ।'

—'স্বতঃসম্ভবী অর্থ কেবল উক্তিমাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন নহে, পরন্তু ইহা বাহ্য জগতেও যথাযোগ্যভাবে সম্ভবপর।'

কিন্তু কাব্যশরীর কেবল স্বতঃসম্ভবী অর্থদ্বারাই নিষ্পন্ন হয় না। যাহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু তাহার বর্ণনা কাব্যে থাকিলেও কবির জগৎ বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাকে বাস্তবমুক্ত বলা যাইতে পারে যে কার্য-কারণ-পরম্পরার দ্বারা বাস্তবজগৎ শৃঙ্খলিত কবির কল্পনা-জগৎ তাহা হইতে একেবারেই মুক্ত। এইজন্যই কবিসৃষ্টিকে 'নিয়তিকৃত-নিয়ম-রহিতা' অভিহিত করা হয়। উহা নিরঙ্কুশ।

বাস্তব জগতে যাহা নাই কবির জগতে তাহা আছে। আমরা যাহাকে অসত্য বলিব কাব্য জগতে তাহাই পরম সত্য হইতে পারে। সেখানে প্রিয়ার পদাঘাতে অশোককুঞ্জ কুসুমিত হয় এবং তাঁহার মুখমদিরাতে বকুল বিকশিত হইয়া উঠে। অতনুর পুষ্পশরে অথবা নায়িকার কটাক্ষেও প্রণয়ীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ অর্থগুলিকে কবিকল্পনাসিদ্ধ বলিতে হইবে। বাহিরের জগতে ইহারা যতই অলীক বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন কবি কল্পনায় এই অর্থগুলি একান্ত সত্য। এই কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে মম্মট মন্তব্য করিয়াছেন,—

'কবিনা প্রতিভামাত্রেণ বহিরসন্নপি নির্মিতঃ'—

—'ইহা বাহিরে না থাকিলেও কবি কর্তৃক প্রতিভামাত্র দ্বারা নির্মিত হয়।'

যে অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ প্রজ্ঞা কবিকে কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা দেয় সেই দৈবী শক্তির বশে এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আবার এই অর্থটি যখন কবিনিবদ্ধ নায়কনায়িকাদির কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পূর্বোক্ত তৃতীয় ভেদটি অর্থাৎ কবি-নিবদ্ধ-বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থটি আমরা পাই। বস্তুতঃ ব্যঞ্জক অর্থের এ তৃতীয় ভেদটি স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে অর্থশক্তিমূলক ধ্বনিস্থলে ব্যঞ্জক অর্থের দুইটি ভেদের কথা বলা হইয়াছে—প্রথমটি প্রৌঢ়োক্তিমাত্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি স্বতঃসম্ভবী। ধ্বন্যালোকের কারিকাটি এইরূপ,—

'প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্ন-শরীরঃ সম্ভবী স্বতঃ।
অর্থোঽপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বস্তুনোঽন্যস্য দীপকঃ॥'

—'অন্য বস্তুর ব্যঞ্জক অর্থও দ্বিবিধ বুঝিতে হইবে—প্রৌঢ়োক্তি-মাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন এবং স্বতঃসম্ভবী।'

কারিকাটির অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে, কল্পনাসিদ্ধ ব্যঞ্জক অর্থের প্রকারভেদের উপর গ্রন্থকারের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। কল্পনাটি কবির হউক বা কবিনিবদ্ধ নায়কাদির হউক তাহাতে খুব বেশি

আসে যায় না ; তাদৃশ কল্পনাসিদ্ধ অর্থদ্বয়ের মধ্যে কল্পনাসিদ্ধত্বরূপ সাজাত্যের কথা মনে রাখিয়াই গ্রন্থকার তাহাদের অবান্তর ভেদের উপর জোর দেন নাই। অবশ্য এই কারিকাটির ব্যাখ্যাকালে কবি বা কবিনিবদ্ধ বক্তার প্রৌঢ়োক্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ অর্থদ্বয়কে দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হয় নাই ; বরং তাহাদের সজাতীয়ত্বেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত কারিকার বৃত্তিটি এইরূপ,—

'অর্থশক্ত্যুদ্‌ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ যো ব্যঞ্জকোঽর্থ উক্তস্তস্যাপি দ্বৌ প্রকারৌ—কবেঃ কবিনিবদ্ধস্য বা বক্তুঃ প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ একঃ, স্বতঃসম্ভবী চ দ্বিতীয়ঃ।'

—'অর্থশক্ত্যুদ্‌ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে যে ব্যঞ্জক অর্থের কথা বলা হইয়াছে তাহারও দুইটি প্রকার—কবি বা কবিনিবদ্ধ বক্তার প্রৌঢ়োক্তিমাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন এক, এবং স্বতঃসম্ভবী দ্বিতীয়।'

এখানেও ব্যঞ্জক অর্থের দ্বৈবিধ্যের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।

জগন্নাথ তাঁহার রসগঙ্গাধরের মধ্যে ব্যঞ্জক অর্থের তৃতীয় ভেদ স্বীকারের প্রতিকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বক্তা কবি হউন বা কবিনিবদ্ধ নায়কাদি হউন, অর্থটি যখন উভয় স্থলেই কবিপ্রতিভানিষ্পন্ন তখন তাহার আবার ঈদৃশ ভেদ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কাব্যের নায়ক নায়িকা যে কথাগুলি বলেন তাহা কি কবির কথা নহে ? নিম্নে জগন্নাথের কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

'প্রতিভানির্বর্তিতত্বাবিশেষাচ্চ কবি-তদুম্ভিত-বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিনিষ্পন্নয়োরর্থয়োর্ন পৃথগ্‌ভাবেন গণনোচিতা।'

—'কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধ-বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থদ্বয়ের পৃথক্‌ভাবে গণনা উচিত হইবে না, কারণ উভয়েই কবি প্রতিভানিষ্পন্ন বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই।'

প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথের উক্তিটি অত্যন্ত সমীচীন। বক্তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অর্থভেদ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত স্বতঃসম্ভবী অর্থেরও

ঈদৃশ দুইটি ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ব্যঙ্গ্যবৈচিত্র্যের স্পষ্টতর বোধের জন্য আমরা পূর্বোক্ত তৃতীয় ভেদটিও উদাহরণ সহকারে আলোচনা করিব।

উপরিউক্ত এই তিন রকমের ব্যঞ্জক অর্থ আবার বস্তু বা অলঙ্কার ভেদে প্রত্যেকে দ্বিবিধ হইতে পারে। সুতরাং ব্যঞ্জক অর্থ ছয় প্রকারের হয়। ইহার প্রত্যেকটি হইতেই বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হইতে পারে। এইরূপে দ্বাদশ প্রকারের অর্থশক্তিমূলক ধ্বনি পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যেকটি প্রকার উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

> 'দৃষ্টিং হে প্রতিবেশিনি! ক্ষণমিবাপ্যস্মদ্‌গৃহে দাস্যসি,
> প্রায়েনাস্য শিশোঃ পিতা ন বিরসাঃ কৌপীরপঃ পাস্যতি।
> একাকিন্যপি যামি সত্বরমিতঃ স্রোতস্তমালাকুলম্‌,
> নীরন্ধ্রাস্তনুমালিখন্তু জরঠচ্ছেদা নলগ্রন্থয়ঃ॥'

—'হে প্রতিবেশিনি! তুমি ক্ষণকাল আমার এই গৃহের দিকেও দৃষ্টি দিবে; এই শিশুর পিতা প্রায়ই কূপের বিরস জল পান করেন না; আমি একাকিনী হইলেও এখান হইতে সত্বর তমালবনপরিবেষ্টিত নদীতে যাইব; নিবিড় কঠিনাবয়ব নল-গ্রন্থিগুলি আমার দেহ খণ্ডিত করে করুক।'

এটি নায়কান্তর-সম্ভোগাকাঙ্ক্ষিণী কোন নায়িকার উক্তি। স্বামী কূপের জল পান করিতে ভালবাসেন না। তাই আসন্ন সন্ধ্যায় গৃহে শিশুটিকে রাখিয়া সে নদী হইতে জল আনিবার জন্য একাকিনীই কন্টকসঙ্কুল পথে যাইবে। তাহাতে তাহার শরীর খণ্ডিত হয় হউক; পতির প্রীতিবিধান তাহাকে করিতেই হইবে। তাই প্রতিবেশিনী সখীকে সে অনুরোধ করিয়া যাইতেছে, সে যেন তাহার গৃহেও একটু দৃষ্টি রাখে। ইহা কবিতাটির বাচ্যার্থ। ঈদৃশ অর্থকে স্বতঃসম্ভবী

এই জন্য বলা যায় যে, ঔচিত্যের দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে কোন অসম্ভাব্যতা বা অসঙ্গতি নাই। উদাসীন শ্রোতা এইরূপ প্রস্তাবকে অত্যন্ত সমীচীন বলিয়াই মনে করিবেন। কিন্তু এই স্বতঃসম্ভবী বাচ্যার্থের অন্তরালে বক্ত্রী ও কালের বৈশিষ্ট্য হেতু একটি অর্থান্তর ধ্বনিত হইতেছে। ঘনায়মান সন্ধ্যায় বিজন নদীসৈকতে নায়িকা নায়কান্তরের সহিত মিলিত হইতে চান; সেই মিলন জনিত নখ-ক্ষতাদির গোপনরূপ বস্তু এখানে ব্যঞ্জনার বিষয়। এই ব্যঙ্গ্যার্থটি শব্দশক্তিমূলক নহে; কারণ কোন বিশেষ শব্দ ইহার উপজীব্য নয়। সমগ্র বাচ্যার্থ সামগ্রী হইতে ইহার উল্লাস। এখানে সমস্ত শব্দগুলিই পরিবৃত্তিসহ। কোন শব্দ পরিবর্তন করিয়া তাহার সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ অটুট থাকিবে। আবার ধ্বনিত অর্থটি কোন উক্তি বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে না বলিয়া ইহা বস্তুধ্বনি—অলঙ্কার ধ্বনি নহে।

স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির আর একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

'অলসশিরোমণি ধূর্ত্তানামগ্রিমঃ পুত্রি! ধনসমৃদ্ধিময়ঃ।
ইতি ভণিতেন নতাঙ্গী প্রফুল্ল-বিলোচনা জাতা॥'

—'হে পুত্রি! এই বর অলসশিরোমণি, ধূর্তশ্রেষ্ঠ এবং প্রচুর ধন-সমৃদ্ধিমান্—এই কথায় নতাঙ্গীর নয়ন দুইটি হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল।'

কবিতার পূর্বার্ধটি কোন স্বয়ম্বরা কন্যার প্রতি ধাত্রীর উক্তি; উত্তরার্ধটি কবির কথা। ধাত্রীমুখে ভাবী পতির গুণাবলী শুনিয়া কন্যা লজ্জায় বিনতা হইলেও তাহার চোখ দুইটি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবিতাটির ইহাই বাচ্যার্থ। কিন্তু এখানে কুমারীর হর্ষবিলোচনস্বরূপ স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে অন্য একটি বস্তুর অভিব্যঞ্জনা হইতেছে যে,—'ইনি কেবল আমারই উপভোগ্য হইবেন এবং ইঁহার কাছে আমি সুখে থাকিব।' কারণ বরটি অলসশিরোমণি বলিয়া প্রবাসে বা নায়িকান্তরের গৃহে যাইবেন না; তিনি ধূর্তশ্রেষ্ঠ

বলিয়া সম্ভোগে সদা অতৃপ্ত থকিবেন এবং প্রচুর ধনশালী বলিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে পারিবেন।

এইরূপ ধ্বনির তৃতীয় দৃষ্টান্তটি ধ্বন্যালোক হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'শিখপিচ্ছকর্ণপূরা জায়া ব্যাধস্য গর্ব্বিণী ভ্রমতি।
মুক্তাফলরচিত প্রসাধনানাং মধ্যে সপত্নীনাম্ ॥'

—'ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পরিধান করিয়া ব্যাধবধূ যে সপত্নীগণ মুক্তা ফলের দ্বারা প্রসাধন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সগর্বে বিচরণ করিতে লাগিল।'

বহুবল্লভ ব্যাধযুবার নব পরিণীতা বধূ সম্পর্কে কবি এই উক্তি করিয়াছেন। আগে করিকুম্ভ বিদারণ-পূর্বক মহার্ঘ মুক্তা-ফল আহরণ করিয়া সে অন্যান্য পত্নীদিগকে উপহার দিত। তৎকালে তাহার সময় ও শক্তির প্রাচুর্য ছিল; কারণ সেই পত্নীগণের প্রতি সে একান্ত আসক্ত ছিল না। কিন্তু অধুনা এই নব পরিণীতা বধূ তাহার এতই প্রিয়া হইয়াছে যে, পূর্বেকার সেই সময় ও শক্তির আধিক্য আর তাহার নাই। সেই বলিষ্ঠ যুবা আজ কোনক্রমে অনায়াস-সাধ্য ময়ূর বধ করিয়া তাহার পুচ্ছ বধূকে উপহার দিতে পারে। সুতরাং ইহার দ্বারা নব পরিণীতার সৌভাগ্যাতিশয় এবং তাহার পূর্ব সপত্নীগণের দুর্ভাগ্যের আধিক্য ধ্বনিত হইতেছে। প্রসাধন কথাটির দ্বারা আরও একটি অর্থের ব্যঞ্জনা হইতেছে যে, অধুনা সপত্নীগণ একেবারেই পতিপ্রেমভাগিনী নহে বলিয়া তাহাদের সম্ভোগ-ব্যগ্রতা নাই। তাই সময়ের প্রাচুর্যবশতঃ পূর্বেকার মুক্তা-ফলগুলি দিয়া তাহারা বিবিধ ভঙ্গীতে অঙ্গসজ্জা রচনা করিতেছে।

দেখা যাইতেছে, কবিতাটির প্রথমার্ধে নবপরিণীতার সৌভাগ্যও দ্বিতীয়ার্ধে সপত্নীগণের দুর্ভাগ্যের কথা ব্যঙ্গ্য হইতেছে। এখানে এইরূপ একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, কবিতাটির মধ্যে গর্ব্বিণী কথাটি উক্ত হওয়াতে গর্বের হেতুরূপে আত্মসৌভাগ্য ও পরদুর্ভাগ্য কবির নিজের কথার দ্বারাই বাচ্য হইয়াছে; সুতরাং ঈদৃশ অর্থকে

ব্যঙ্গ্য বলার যৌক্তিকতা কোথায় ? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, গর্বের হেতু বালসুলভমূঢ়তা প্রভৃতিও হইতে পারিত। কিন্তু সে সব অর্থ না বুঝিয়া আমরা যে পূর্বোক্ত অর্থটিই বুঝিতেছি তাহার কারণ ব্যঞ্জনা শক্তির মহিমা। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁহার লোচন-টীকার মধ্যে এই কথাই বলিয়াছেন।

'গর্ব্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নাত্র স্বোক্তিসম্ভাবঃ শঙ্ক্যঃ।'

—'বাল্যাবস্থার অবিবেকাদি হেতুও গর্ব হয়; সুতরাং এখানে কবি নিজে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে।' আবার বহির্জগতে এইরূপ ব্যাপার অহরহঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া এখানে বাচ্য অর্থটি স্বতঃসিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি আশঙ্কার নিরসন হওয়া আবশ্যক। এখানে কাহারও কাহারও ব্যতিরেক অলংকার ধ্বনিত হইয়াছে মনে হইতে পারে। আমরা জানি ব্যতিরেক অলঙ্কারে একের অপেক্ষা অন্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রতীত হয়। এখানে সপত্নীগণ অপেক্ষা নব পরিণীতার সৌভাগ্যের উৎকর্ষ ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীত হইতেছে। সুতরাং এখানে ব্যতিরেকালঙ্কার-ধ্বনি হইবে না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্যতিরেক মাত্রেই ব্যতিরেকালঙ্কারের স্থল নহে। রাম শ্যাম অপেক্ষা ভাল—এখানে ব্যতিরেক থাকিলেও অলঙ্কার নাই। কারণ যে উক্তিবৈচিত্র্যজনিত চমৎকৃতি অলঙ্কারের প্রাণ এইরূপ বাক্যের মধ্যে তাহার অভাব আছে। একই কারণে পূর্বোক্ত উদাহরণ কবিতাটির মধ্যে ব্যতিরেকবস্তুর ধ্বনি থাকিলেও ব্যতিরেক অলঙ্কারের ধ্বনি নাই। তবে কাব্যকথার বৈচিত্র্য ও চমৎকৃতির চরম নিকষ সহৃদয়ের অনুভব। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে, এখানে ধ্বনিত ব্যতিরেক বস্তুটি অলঙ্কার হইবার যোগ্য তবে তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না ; কারণ কাহারও সেরূপ মনে করাতে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য ধ্বনিত্বের কিছুমাত্র হানি হইতেছে না।

স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির স্বরূপটি যাহাতে অধিকতর স্পষ্ট

ও সুখবোধ্য হয় সেজন্য ধ্বন্যালোক গ্রন্থ হইতে ইহার আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে।

'ভ্রম ধার্ম্মিক! বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরী-নদীকূল-লতাগহন-বাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥'

—'হে ধার্ম্মিক! তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর; গোদাবরী নদীর কূলে লতাকুঞ্জের মধ্যে যে দৃপ্তসিংহটি বাস করে তাহার দ্বারা সেই কুকুরটি আজ নিহত হইয়াছে।'

নদীতীরে পুষ্পিত লতাকুঞ্জের মধ্যে কোন নায়িকা নায়কের সহিত মিলিত হইতেন। স্থানটি অত্যন্ত নির্জন ও গুপ্ত ছিল বলিয়া প্রিয়-মিলনের একান্ত অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক তপস্বী দেবার্চ্চনার জন্য নিত্য পুষ্পপল্লবাদি চয়ন করিয়া সেই সঙ্কেত স্থানের সৌন্দর্য্য ও গোপনীয়তা ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া দিতেছিলেন। তাই সেই তপস্বীর উদ্দেশে নায়িকা এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। নির্জন নদী তীরে যে কুকুরটি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত তাহার স্পর্শে পাছে শারীরিক শুচিতার হানি হয় সেইজন্য হয়তো তপস্বী নিশ্চিন্তভাবে পুষ্প চয়ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু আজ হইতে তাঁহার আর সে ভয় থাকিল না। নদীতীরে নিবিড় অরণ্যে যে তেজস্বী সিংহটি বাস করে সে-ই কুকুরটিকে আজ মারিয়া ফেলিয়াছে। তপস্বীর নিশ্চিন্ত বিচরণে আর কোন বাধা নাই। তিনি এখন স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও পুষ্প চয়ন করিতে পারেন। কবিতাটির বাচ্যার্থ এই পর্যন্তই। দেখা যাইতেছে, উহা ভ্রমণের বিধিতে অর্থাৎ 'তুমি ভ্রমণ কর'—এইরূপ অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু যে নায়িকা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য বশে পূর্বোক্ত বাচ্য ভ্রমণবিধির অন্তরালে ভ্রমণ-নিষেধই ধ্বনিত হইতেছে। নায়িকার প্রিয় মিলন কুঞ্জটির সৌন্দর্য ও গোপনীয়তা নিত্য অবলুপ্ত হইতে থাকুক—ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সঙ্কেত স্থানের বিঘ্নটি অপসারিত করার ইচ্ছাটিই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। নায়িকার

বাক্যভঙ্গী হইতেও সেই ইচ্ছাই প্রকট হইয়াছে। এই কথা বলা যায় [illegible] মৃত্যুর কারণস্বরূপ তিনি সিংহের উল্লেখ করিয়াছেন। কুকুর অন্য কারণে বিনষ্ট হয় নাই; সিংহই তাহাকে বধ করিয়াছে। সে সিংহটি আবার স্থানান্তরে থাকে না, নদীতীরে লতাকুঞ্জের মধ্যে তাহার বাস। সে আবার দৃপ্ত; সুতরাং জিঘাংসাবৃত্তি তাহার অত্যন্ত বলবতী। নায়িকা হয়তো মনে করিয়াছিলেন তপস্বী ভীরু; সুতরাং সিংহের উল্লেখে তিনি ভীত হইয়া আর সে স্থানে আসিবেন না। এইরূপ একটি অনিশ্চিত আশার বশবর্তিনী হইয়াই তিনি পূর্বোক্তরূপ বাগ্‌ভঙ্গীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক বক্ত্রী, দেশ, প্রকরণ, বাক্য প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হেতু এখানে বাচ্য বিধি হইতে ব্যঙ্গ্য নিষেধের প্রতীতি হইতেছে। 'তুমি ভ্রমণ কর' ইহা কবিতাটির বাচ্যার্থ হইলেও 'তুমি আর এখানে ভ্রমণ করিতে আসিও না' ইহাই তাহার ধ্বনি। এই ধ্বনিগম্য অর্থটি বাচ্যার্থ অপেক্ষা সুন্দরতর হইয়াছে বলিয়া রচনাটি ধ্বনিকাব্যের বিষয়ীভূত।

উপরিনিবদ্ধ উদাহরণটিতে আমরা দেখিলাম, বাচ্য বিধি হইতে নিষেধের ব্যঞ্জনা হইতে পারে। এইবার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে বাচ্য নিষেধ হইতে বিধির ব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জতি, অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক! রাত্র্যন্ধ! শয্যায়ামাবয়োর্মাজ্ক্ষীঃ॥'

—'এখানে শাশুড়ী নিদ্রায় মগ্ন থাকেন, এখানে আমি। সারাদিন দেখিয়া রাখ। হে রাতকানা পথিক! তুমি আমাদের শয্যায় ঢুকিও না।'

কোন প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা গৃহাগত তরুণ পথিকের উদ্দেশে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। উক্তিটির বাচ্যার্থ শয্যায় প্রবেশ-নিষেধ; কিন্তু বক্ত্রী, বোদ্ধব্য, দেশ, কাল, কাকু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যে এই বাচ্য নিষেধের অন্তরালে ব্যঙ্গ্য বিধির প্রতীতি অস্বীকার করা যায় না। নায়িকা মুখে যাহাই বলুন না কেন তাঁহার কথাগুলির দ্যোতনা হইতেছে—নিভৃতে রাত্রির অন্ধকারে আপন শয্যায় পথিককে আহ্বান

জ্ঞা[illegible]খবোধ্য হয়। এখানে নিষেধ বাচ্য হইলেও বিধি ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। 'তুমি আসিও না' ইহা মুখের বাক্য হইলেও 'তুমি আসিও'—ইহাই নায়িকার অন্তরের কথা। ইতিপূর্বে আর্থী ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গে এই উদাহরণটি বিস্তৃততর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এখন রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে ঈদৃশ বস্তুধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 'বিদায় অভিশাপের' মধ্যে একস্থলে কচ ও দেবযানীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে আছে—

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।
দেবযানি। হাসি ? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম-মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে ; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—

এখানে দেখা যাইতেছে, সুদীর্ঘ সাহচর্যের ফলে কচ ও দেবযানীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেবযানী হাসিমুখে কচকে বিদায় দিতে পারিতেন না। কুসুমে কীটের মত হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে তিনি কচের সঙ্গলিপ্সা পোষণ করিয়াছেন। কচ চলিয়া গেলেও অতীত সুখস্মৃতি তিনি ভুলিতে পারিবেন না। অথচ তাঁহার 'যাও বন্ধু' এই উক্তির মধ্যে বিদায়ের বিধিই বাচ্য হইয়াছে। সুতরাং এই বাচ্য বিধির ব্যঞ্জনা হইতেছে নিষেধ—'তুমি যাইও না'। কথাগুলি যিনি বলিয়াছেন এবং যাঁহাকে বলা হইয়াছে তাঁহাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্য হইতে এইরূপ ধ্বনির প্রতীতি হইতেছে। আশাহতা দেবযানী মুখে যাহাই বলুন না কেন তাঁহার অন্তরের কথা সহৃদয়

মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এবং তাহাই এখানে কাব্যার্থরূপে গৃহীত হইবে।

এপর্যন্ত আমরা স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছি। এইবার স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনির স্বরূপ বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য হইতে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'দিশি মন্দয়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে॥'

—দক্ষিণ দিকে গেলে সূর্যেরও তেজ মন্দীভূত হইয়া যায়; সেই দিকেই রঘুর প্রতাপ পাণ্ড্য রাজগণ সহ্য করিতে পারেন নাই।

এই কবিতাটি মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে রচিত। দক্ষিণায়ণ হইলে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজও মৃদু হইয়া যায়। কিন্তু মহারাজ রঘু যখন দক্ষিণ দেশীয় নরপতিগণকে বিজয় করিতে গেলেন তখন তাঁহার প্রতাপে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এটি স্বতঃসম্ভবী বাচ্য বস্তু। ইহা হইতে যে অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা হইতেছে তাহার স্বরূপ দাঁড়ায়—মহারাজ রঘু সূর্য্যের অপেক্ষাও অধিক প্রতাপশালী ছিলেন; কারণ যে দক্ষিণ দিক সূর্যকেও অভিভূত করিয়া ফেলে তাহা রঘুকে অভিভূত করিতে পারে নাই, বরং রঘুই তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই ব্যঙ্গার্থের মধ্যে সূর্যের অপেক্ষা মহারাজ রঘুর উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে বলিয়া ইহা ব্যতিরেক-মূলক; এবং এইরূপ ব্যতিরেক চমৎকৃতি-ভূয়িষ্ঠ বলিয়া কবিতাটি ব্যতিরেকালঙ্কার ধ্বনির স্থল। এমনি ভাবে অন্যান্য অলংকারগুলিও স্বতঃসম্ভবী বস্তু হইতে ধ্বনিত হইতে পারে।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ ধরণের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 'চিত্রা'র মধ্যে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির প্রারম্ভ এইরূপ—

'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত

মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।'

কাব্যকল্পনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যালোক কবির আর ভালো লাগিতেছে না। যাহা একান্তভাবে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরহিত, মাত্র সেই কল্পলোকে স্থিতির আকাঙ্ক্ষা তো পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তাই কবির অন্তর্নিহিত কর্মপ্রেরণা জগতের রূঢ়তা ও কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। বিপুল সমস্যা-কণ্টকিত মানব সমাজ তাঁহাকে আজ ডাক দিয়াছে। সহস্র অভাব, অত্যাচার, দুঃখ, দৈন্যপীড়িত আপন গোষ্ঠীর মধ্যেই তিনি কর্মরত হইবেন; সেখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া কল্পনা-সৃষ্ট একটি রহস্য-ঘন লোকে অবস্থান তাঁহার কাম্য নহে। উদ্ধৃত কবিতাংশটি নিপুণ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, রচনার বাচ্যার্থের অন্তরালে একটি ব্যতিরেক অলংকার ধ্বনিত হইতেছে। বাস্তব জগতে কর্মরত জীবন অপেক্ষা কাব্যলোকের আরামের জীবন নিকৃষ্টতর ইহাই সেই ব্যতিরেকের স্বরূপ; এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই এখানে কবি-কৃতির মাধুর্য আবর্তিত হইতেছে। প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয় যে অধিকতর কাম্য—এটি এখানে ব্যঞ্জনা-লব্ধ অর্থ। এই রচনাটি সম্বন্ধে কবি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট অনুমোদন মিলিবে।

'যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশীর সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।... মাধুর্যের যে শান্তি, এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।...বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশীর ললিত সুরে নয়।...এ আহ্বান তো শক্তিকেই

আহ্বান ; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।'

কবির উক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, তিনি আমাদের পূর্বোক্ত ধ্বনিত ব্যতিরেকের কথাই বলিয়াছেন। 'যখন সকলে কর্মরত তখন তুই বাঁশী বাজাইলি'—ইহাই রচনার বাচ্যার্থ। এই অর্থটি স্বতঃসম্ভবী, কারণ ইহার মধ্যে কবিকল্পনার কোন অবকাশ নাই। যখন সকলে কাজ করে তখন কেহ বাঁশী বাজাইতেও পারে ; লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই। তারপর প্রকরণাদির বশে ব্যঞ্জনাশক্তির মহিমায় ঈদৃশ স্বতঃসম্ভবী বাচ্যার্থ হইতে একটি ব্যতিরেকালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে যে, আরামের জীবন অপেক্ষা কর্মময় জীবন মহীয়ান্ ও কাম্যতর। এখন কবিতাটির ব্যঙ্গ্যার্থ যিনি যেভাবেই বুঝুন না কেন সকলের প্রতীতিই এই ব্যতিরেক-মূলক হইবে। এখানে ধ্বনিটির স্বরূপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির এই সুস্পষ্ট স্তর দুইটির কথা মনে রাখিতে হইবে।

এইবার স্বতঃসম্ভবী বাচ্য অলংকার হইতে বস্তুধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'আপাতন্তমমুং দূরাদূরীকৃতপরাক্রমঃ।
বলোঽবলোকয়ামাস মাতঙ্গমিব কেশরী॥'

—'যুদ্ধের জন্য কৃত-প্রতিজ্ঞ বলরাম অভিমুখাগত উহাকে সিংহ দূর হইতে যেমন মাতঙ্গকে অবলোকন করে সেইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন।' এখানে বিপুলবিক্রমহেতু বলরামকে কেশরীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই সাদৃশ্য লোক প্রসিদ্ধ বলিয়া এখানে বাচ্য উপমালঙ্কারটি স্বতঃসম্ভবী। ইহা হইতে যে বস্তুটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা এইরূপ—বলরাম ক্ষণকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে শত্রুক্ষয় করিবেন। অনুরূপভাবে স্বতঃসম্ভবী অন্য বাচ্য অলঙ্কার হইতেও বস্তুধ্বনি হইতে পারে।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কবির 'বলাকা' কবিতাটির প্রারম্ভ এইরূপ—

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;'

এখানে কবি অন্ধকার-মলিন নদীস্রোতকে কোষবদ্ধ তরবারির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং উপমালঙ্কার রচনাটির মধ্যে বাচ্য হইয়াছে। এই উপমাটি আবার স্বতঃসম্ভবী, কারণ ইহার উপমেয় নদী বা উপমান তরবারি কোনটিই অলৌকিক বস্তু নহে। ঈদৃশ স্বতঃসম্ভবী বাচ্য উপমালংকার হইতে ব্যঞ্জনাশক্তির বশে এখানে অর্থান্তরের প্রতীতি হইতেছে। সন্ধ্যায় অন্ধকার-মলিন নদীস্রোতের তনুতা, ক্রমবর্দ্ধমান অস্পষ্টতা, তাহার পরম প্রশান্তি ও স্তব্ধতা, স্বাভাবিক স্বচ্ছতার অবগুণ্ঠন, অন্তর্নিলীন হিংস্রতা, পুনঃ প্রকাশের সম্ভাব্যমানতা প্রভৃতি অশেষ ধর্ম ঐ কোষবদ্ধ তরবারির সাদৃশ্যকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। এগুলি সমস্তই বস্তুধ্বনি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে বাচ্য অলংকারটি মাত্র সাদৃশ্য বোধনে পর্য্যবসিত হইলেও ধ্বনিগম্য অর্থগুলির ব্যাপ্তি অপরিসীম ; এবং উহাই রচনাংশটির চারুত্বের হেতু হইয়াছে। উপমাটি সুন্দর হইলেও ব্যঞ্জনাটি সুন্দরতর হইয়াছে। তাই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্যহেতু এটিকে ধ্বনিকাব্য বলিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, 'বলাকা' কবিতাটির অর্থ খুব জটিল এবং তাহার সামগ্রিক ধ্বনি গভীরতর। তাহা এখানে আমরা আলোচনা করিতেছি না। ঠিক এই কয়টি ছত্রে যে বস্তুধ্বনি আছে তাহার ব্যাখ্যাই এখানে দেওয়া হইল।

এইবার স্বতঃসম্ভবী অলংকার হইতে অলংকার ধ্বনির একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'গাঢ়কান্ত-দশন-ক্ষতব্যথা-সঙ্কটাদরি-বধূজনস্য যঃ।
ওষ্ঠ-বিদ্রুম-দলান্যমোচয়ন্নির্দশন্ যুধি রুষা নিজাধরম্।'

—যিনি যুদ্ধে ক্রোধবশতঃ আপন অধর দংশন করিতে করিতে শত্রুবধূগণের ওষ্ঠপ্রবাল-খণ্ডগুলিকে নিজ নিজ পতি কর্তৃক বিহিত

তীব্র দন্তক্ষত ব্যথার বিপত্তি হইতে মোচন করিয়াছিলেন।

এখানে বিরোধাভাস নামক অলংকার বাচ্য হইয়াছে। যিনি নিজের অধরকেও দংশন করিতেছেন তিনি কি করিয়া পরের অধরকে দংশন হইতে রক্ষা করিবেন? এইটি এখানে বিরোধের স্বরূপ। কিন্তু বস্তুতঃ এখানে অর্থদ্বয়ের কোন বিরোধ নাই; কারণ ক্রোধ হেতু শত্রু বধ করিয়া পতিহীনা শত্রুবধূগণের অধরগুলিকে তিনি দংশন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা আপাতদৃশ্যমান বিরোধের পরিহার সম্ভব। সুতরাং এখানে অর্থদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই—বিরোধের আভাসমাত্র আছে। তাই অলংকারটির নাম বিরোধাভাস। ইহা এখানে বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বাচ্য বিরোধাভাস অলংকারের অন্তরালে অন্য দুইটি অলংকার ধ্বনিত হইতেছে—একটি সমুচ্চয় এবং দ্বিতীয়টি উৎপ্রেক্ষা। দুইটি গুণ বা ক্রিয়া যুগপৎ নিষ্পন্ন হইলে সমুচ্চয় নামক অলংকার হয়। এখানে নিজ অধর দংশন এবং রিপুবনিতার অধর মোচনরূপ ক্রিয়াদ্বয়ের যুগপৎ নিষ্পত্তির ব্যঞ্জনা আছে। সুতরাং সমুচ্চয়ালংকার ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বলা যায়। আবার কবিতাটির মধ্যে উৎপ্রেক্ষারও ধ্বনি আছে। আমার ক্ষতির দ্বারা অন্যের ক্ষতি নিবারিত হউক—রাজা যেন এই কথা ভাবিয়া তাদৃশ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ নৃপ-বুদ্ধি এখানে উৎপ্রেক্ষার বিষয়। কিন্তু এই উৎপ্রেক্ষিত অর্থটি কবিতার মধ্যে কোথাও বাচ্য হয় নাই। বাচ্যার্থবোধের পরবর্তীকালে সহৃদয়চিত্তে ইহার উল্লাস হয়। সুতরাং এখানে উৎপ্রেক্ষা ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বলিতে হইবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বাচ্য অলংকার হইতেও অলংকারান্তরের ব্যঞ্জনা হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই কবিতাটির মধ্যে সমুচ্চয় এবং উৎপ্রেক্ষালংকার যেমন ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বিরোধাভাস অলংকারও তেমনি বাচ্য হইয়াছে। সুতরাং ব্যঙ্গ্যার্থের দিক্ হইতে যদি ইহাকে ধ্বনিপ্রধান কাব্য বলা হয় তাহা হইলে বাচ্যার্থের দিক্ হইতেও ইহাকে অলংকারপ্রধান কাব্য বলা যাইবে না কেন? ইহার উত্তরে

বক্তব্য এই যে, যেটি প্রধান তদনুসারে নামকরণই ঔচিত্যের দিক্ দিয়া সমীচীন। সংস্কৃতে একটি কথা আছে—'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি,'—'প্রাধান্য অনুসারে নাম হইয়া থাকে'। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রধান হইয়াছে ; তাই কাব্যটিকে অলংকার-প্রধান না বলিয়া ধ্বনি-প্রধান বলা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয় না। এখন প্রশ্ন আসে, এই তথাকথিত প্রাধান্য বা অপ্রাধান্যের নিয়ামক হেতুটি কী? এখানে ব্যঙ্গ্য উৎপ্রেক্ষাকে প্রধান না বলিয়া বাচ্য বিরোধাভাসকে প্রধান বলিতে দোষ কী? এ প্রশ্নের উত্তর আনন্দবর্ধন নিজেই ধন্যালোক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

'চারুত্বোৎকর্ষ-নিবন্ধনা হি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা'।

—বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোন একটি যে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তাহার হেতু কাব্য সৌন্দর্যের উৎকর্ষ।

যেখানে যে অর্থটি অধিক চমৎকারী সেখানে সেইটিই প্রধান বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি কোন রচনাতে বাচ্যার্থকে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা সুন্দরতর মনে হয় তাহা হইলে সেখানে বাচ্যার্থকেই প্রধান বলিয়া ধরিতে হইবে। কবি-কৃতির মধ্যে এইরূপ রচনা বিরলও নহে। যেমন, দীপক অপহ্নুতি প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক বাচ্যালংকারের মধ্যে সাদৃশ্যটি অন্তর্লীন হইয়া থাকে। তাই সে সব অলংকারে উপমাটি ব্যঞ্জনাগম্য হইয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু যেহেতু সে সকল কাব্যে ওই ব্যঙ্গ্য উপমা অপেক্ষা বাচ্য দীপক অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকার অধিকতর সুন্দর, সেই হেতু সেগুলিকে ধ্বনিপ্রধান না বলিয়া অলংকার প্রধান কাব্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রথমে দীপক অলংকারের একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটি স্পষ্টতর করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

'মণিঃ শাণোল্লীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ
কলাশেষশ্চন্দ্রঃ সুরতমৃদিতা বালললনা।
মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্যানপুলিনা

স্তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু জনাঃ ॥'

—শাণ-ঘৃষ্টমণি, বানবিদ্ধ যুদ্ধবিজয়ী বীর, কলাবশিষ্ট চন্দ্র, সম্ভোগে অবসন্না তরুণী, মদক্ষীণ হস্তী, শরৎকালে শুষ্কপুলিনা নদী এবং প্রার্থিগণকে দান করিয়া রিক্তবৈভব ব্যক্তিগণ কৃশতার দ্বারাই শোভা পাইয়া থাকেন।

কবিতাটির মধ্যে দীপক অলংকার বাচ্য হইয়াছে। এখানে 'শোভা পাইয়া থাকে' এই একই ক্রিয়ার সহিত মণি প্রভৃতি বহু বিশেষ্যের অন্বয় হওয়াতে এটি ক্রিয়াদীপকের স্থল বুঝিতে হইবে। আবার এই বাচ্য দীপক অলংকারের অন্তরালে উপমাও ব্যঙ্গ্য হইয়া বর্তমান আছে; কারণ তনুতারূপ সাধারণ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত মণি প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষ্য পদের মধ্যে উপমান-উপমেয়-ভাব কল্পনা সম্ভবপর। কিন্তু তাই বলিয়া এই রচনাটিকে ধ্বনিপ্রধান কাব্য বলা যাইবে না। এটি বাচ্যালঙ্কারপ্রধান কাব্য। তাহার কারণ হইতেছে, এখানে কাব্য সৌন্দর্যের হেতু ঐ বাচ্য দীপক অলংকারটুকু—ব্যঙ্গ্য উপমা নহে। কবিতাটি পাঠ করিলে আমাদের যে আনন্দবোধ হইতেছে তাহার মূলে আছে পূর্বোক্ত বহু প্রকার বিশেষ্যের একই ক্রিয়ার সহিত সুনিপুণ অন্বয়। সেগুলির মধ্যে যে সাদৃশ্য ব্যঙ্গ্য হইতেছে চমৎকারিতার দিক্ দিয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং বাচ্য দীপকই এখানে প্রধান, আর উপমা ব্যঙ্গ্য হইয়াও প্রধান হইতে পারে নাই।

দেখা গেল, কোন বাচ্য অলংকার হইতে অলংকারান্তরের ব্যঞ্জনা হইলেই রচনাটি ধ্বনি-কাব্য হইয়া উঠিবে না। ব্যঞ্জনা-গম্য অলংকারটি তাহার ব্যঞ্জক বাচ্যালংকার অপেক্ষা অধিকতর চারু হইলে তবে তাদৃশ কাব্যকে ধ্বনি কাব্য বলা যাইবে। নিম্নে অপহ্নুতি অলংকারের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতেও একই সত্য প্রমাণিত হইবে।

'নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী মদেন মুখরা মুহুঃ।
অয়মাকৃষ্য-মানস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনিঃ ॥'

—ইহা মদমুখর মধুকর শ্রেণীর মুহুর্মুহুঃ গুঞ্জন নহে ; এ তো মদনের আকৃষ্যমাণ ধনুকের শব্দ।

এই রচনাটির মধ্যে অপহ্নুতি অলংকার বাচ্য হইয়াছে। প্রকৃত বস্তুর অপলাপ করিয়া তৎস্থলে অন্য বস্তুর আরোপ হইলে অপহ্নুতি অলংকার হইয়া থাকে। এখানে বর্ণনীয় বিষয় ভ্রমরগুঞ্জন হইলেও তাহার প্রতিষেধ করিয়া তৎস্থলে মদনের ধনুক-শব্দের আরোপ করা হইয়াছে। আবার এই উভয় শব্দের মধ্যে কামোদ্দীপকতা-রূপ যে সাধারণ ধর্ম রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া উপমাও এখানে ব্যঙ্গ্য হইতেছে—ভৃঙ্গধ্বনি উপমেয় এবং মদনের ধনুকধ্বনি উপমান। কিন্তু যেহেতু এস্থলে কাব্যসৌন্দর্যের হেতু ঐ বাচ্য অপহ্নুতি-অলংকার—ব্যঙ্গ্য উপমা নহে—সেই হেতু ইহা ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ হইতে পারে না। এক অলংকার হইতে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট নহে। সেই ব্যঞ্জনা-লভ্য অলংকারটি তাহার ব্যঞ্জক অলংকার অপেক্ষা চারুতর হইলে তবে রচনাটি ধ্বনিকাব্যের এলাকার মধ্যে আসে। বলা বাহুল্য, এই কাব্যগত চারুতা বা অচারুতার চরম নিকষ সহৃদয়ের অনুভব—এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই।

এখন রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে ঈদৃশ ধ্বনিকাব্যের একটি উদাহরণ নিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে। 'কাহিনী' নাট্য-কাব্যে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নামক কবিতার মধ্যে কুন্তীর উক্তির একস্থলে আছে—

'ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন ; তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে।'

যিনি পঞ্চপুত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন তাঁহার চিত্ত পুত্রহীন—এইরূপ উক্তির মধ্যে বিরোধাভাস অলংকার বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বাচ্যালংকারটির অন্তরালে একটি ব্যতিরেক অলংকারের দ্যোতনা হইতেছে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্রের সমবেত গুণরাশি অপেক্ষা একমাত্র

কর্ণের গুণ কুন্তীর নিকট অধিকতর আহ্লাদজনক—এইটি এখানে ধ্বনিত ব্যতিরেকালংকারের স্বরূপ। যেহেতু এই ধ্বন্যমান অলংকারটি ঐ বাচ্য অলংকার অপেক্ষা চারুতর হইয়াছে সেই জন্য রচনাটি ধ্বনিকাব্যের বিষয়ীভূত।

এ পর্যন্ত স্বতঃসম্ভবী অর্থ হইতে যে চারি প্রকার ধ্বনিকাব্যের সম্ভব হইতে পারে তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। এখন কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থ হইতে ধ্বনির যে বিভিন্ন প্রকারগুলি পাওয়া যায় তাহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ববৎ কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থও প্রথমতঃ বস্তু এবং অলংকার ভেদে দ্বিবিধ। ইহারা আবার প্রত্যেকে বস্তু বা অলংকারের অভিব্যঞ্জনা করিতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর ধ্বনিকাব্যও চারি প্রকারের হইতে পারে। কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'সজ্জয়তি সুরভিমাসো ন তাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্য-মুখান্।
অভিনব-সহকার-মুখান্নবপল্লব-পত্রলাননঙ্গস্য শরান্ ॥'

—অনঙ্গশরাগ্রের লক্ষ্য যুবতীগণ; উহার অগ্রভাগে আম্রমুকুল পশ্চাতে নবপল্লব। চৈত্রমাস ঐ শরগুলিকে সজ্জিত করিতেছে—এখনও অনঙ্গকে অর্পণ করে নাই।

কবিতাটির মধ্যে বসন্তের অভ্যাগম বর্ণিত হইয়াছে। মদন ধনুক ধারণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ের অভিযান করিবেন। বসন্তকাল তাঁহার সখা; তাই মদনের জন্য বসন্ত শর প্রস্তুত করিতেছেন। শরগুলির শাণিত অগ্রভাগ পুষ্প-নির্ম্মিত; কিশলয় পক্ষরূপে যুক্ত হইয়াছে। এই শরগুলির লক্ষ্য কিন্তু সকলে নহেন—মাত্র যুবতী নারীগণ। বসন্ত এগুলিকে প্রস্তুত করিতেছেন—এখনও সখার হস্তে অর্পণ করেন নাই। কবিতাটির বাচ্য অর্থ এই পর্য্যন্তই। এই অর্থটি কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ; কারণ বসন্ত কর্তৃক শরপ্রস্তুতি অথবা কামদেব কর্তৃক পুষ্পশর দ্বারা যুবতী নারীর বক্ষোবিদারণ—এগুলি লৌকিক জগতের বস্তু নহে। কবিকল্পনার অলৌকিক মহিমায় এই অলীক বস্তুগুলি

সত্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ঈদৃশ বাচ্য অর্থ কিন্তু এইখানেই বিরত হয় নাই—ইহা অর্থান্তরের দ্যোতনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রণয়রক্ত হৃদয়গুলির দুঃসহ মদন-ব্যথার মাত্র প্রারম্ভ হইয়াছে ; ইহা ক্রমশই বর্ধিত হইয়া যে অনুরাগি-চিত্তকে নিঃশেষে মথিত করিবে—তাহাই এস্থলে দ্যোতনার বিষয়। 'প্রস্তুত করিতেছে—অর্পণ করে নাই'—এইরূপ উক্তি প্রণয়ব্যথার অবধারিত ক্রমবর্ধমানতাকে সূচিত করিতেছে। এই সঙ্কট কালে যাঁহারা আহত হইবেন তাঁহাদের অভিযোগের পথও রুদ্ধ ; কারণ যিনি আঘাত করিতেছেন তিনি তো অঙ্গরহিত—একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাহিরে ; তাঁহার উপর পাল্টা আক্রমণ চলে না। আর এই অঙ্গরাহিত্যরূপ রক্ষাকবচের অন্তরালে থাকিয়া তিনি সমর নীতির পথও ত্যাগ করিয়াছেন ; কারণ শাস্ত্র নারীকে অবধ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেও তিনি বাছিয়া বাছিয়া নারী-গুলিকেই বধ করিতেছেন। তাঁহার শরগুলিও খণ্ডনের যোগ্য নহে, কারণ সেগুলি পুষ্পনির্মিত। নিখিলের সমস্ত কুসুমের যুগপৎ বিলুপ্তি কোন্ অস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ? সুতরাং নব বসন্তে প্রণয়-বেদনা অসহ্য হইলেও অপ্রতিকার্য। এইরূপে বিবিধ বস্তু পূর্বোক্ত কবি প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থ হইতে ধ্বনিত হইতেছে

রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে 'ধুলামন্দির' নামক কবিতাটিতে কবি লিখিয়াছেন—

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ ; খাটছে বারোমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার 'পরে।'

এই কবিতাটির বাচ্যার্থ স্পষ্ট। যেখানে কৃষক নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছে, যেখানে শ্রমিক পাথর ভাঙিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে সেইখানে দেবতা গিয়াছেন। তিনি রৌদ্রে বৃষ্টিতে

সকলের সঙ্গে আছেন ; তাঁহার হস্তদ্বয় ধূলিধূসরিত। তুই শুচি বসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার মতন ধূলার উপরে আয়—রচনাটির বাচ্যার্থ এই পর্যন্ত। এই বাচ্যবস্তুটি আবার কবি-কল্পিত ; কারণ দেবতা ক্লান্ত শ্রমিকের সহিত ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইতেছেন—ইহা কবিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অভিধা শক্তি এখানে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তুকে বুঝাইতেছে। কিন্তু এই বাচ্য বস্তুর অন্তরালে যে একটি রমণীয় অর্থান্তরের দ্যোতনা হইতেছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। জীবনের সমস্ত আলস্য, জড়তা ও ঔদাসীন্যের অবসান ঘটাইয়া কঠোর কর্মযোগী হইবার জন্য কবি সকলকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। রূঢ় বাস্তবের বিভীষিকায় ভীত হইয়া তাহা পরিহার করিবার জন্য যাহারা রুদ্ধদ্বার দেবালয়ে বসিয়া সাধন ভজন করে তাহাদের তথাকথিত ভক্তিযোগ জড়ত্বেরই নামান্তর মাত্র। সেখানে সত্ত্বের আভাস মাত্র থাকে ; বস্তুতঃ তাহা তমোগুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই তামসিকতার আধিক্যে মানুষের সত্যদৃষ্টি হয় কলুষিত—তাহার সাধনা হয় ব্যর্থ। এই পথে সে কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এ পথ তাহাকে পরিহার করিতে হইবে। সে ভক্তিযোগের অধিকারী নহে ; কর্মযোগ তাহার গ্রহণীয়। কর্মের সাথে তাহার জড়তার অবসান হইবে। তমোগ্রস্ত চিত্তের মল ক্ষালিত হইয়া গেলে তাহাতে শুদ্ধা ভক্তির প্রকাশ আপনা হইতেই হইবে। তাই কবি কল্যাণলাভেচ্ছু সাধককে কর্মযোগে নিরত হইতে আহ্বান করিতেছেন। সেই পথেই সে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, কবিতার এই ধ্বন্যমান অর্থটি উহার বাচ্যার্থ অপেক্ষা চারুতর, যদিও বাচ্যার্থ হইতেই ইহার উল্লাস। তাই রচনাটির মধ্যে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে।

এইবার কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'রজনীষু বিমলভানোঃ করজালেন প্রকাশিতং বীর।

ধবলয়তি ভুবনমণ্ডলমখিলং তব কীর্ত্তিসন্ততিঃ সততম্ ॥'

—হে বীর! রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণে প্রদীপ্ত জগৎকে তোমার যশোরাশি নিরন্তর শুভ্র করিয়া রাখিয়াছে।

এই কবিতাটির মধ্যে কোন বীরের স্তুতিগান করা হইয়াছে। যে জগৎ মাত্র নিশাকালে চন্দ্রকিরণ-স্নাত হইয়া শুভ্রতা প্রাপ্ত হয়, এই বীরের যশোরাশি তাহাকে নিত্য-শুভ্র করিয়া রাখিয়াছে। এই বাচ্য বস্তুটি কবি কল্পনাসিদ্ধ; কারণ কীর্তির ধবলত্ব লৌকিক জগতে অনুভবসিদ্ধ নহে। ঈদৃশ বাচ্য অর্থ হইতে একটি ব্যতিরেকালংকারের ব্যঞ্জনা হইতেছে। যশোরাশি চন্দ্রকিরণ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী, অক্ষয় এবং প্রদীপ্ততর—ইহাই সেই ব্যতিরেকের স্বরূপ। ব্যঞ্জনা-লব্ধ এই ব্যতিরেকার্থটি পূর্বোক্ত বাচ্যার্থ অপেক্ষা চারুতর হইয়াছে বলিয়া কবিতাটিকে ব্যতিরেক-অলংকার ধ্বনির স্থল বলা যাইতেছে।

নিম্নে যে কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইবে, কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ধ্বনি হইতেছে।

'চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমূর্চ্ছিতঃ।
মূর্চ্ছয়ত্যেয পথিকান্ মধৌ মলয়মারুতঃ ॥'

—'চন্দনবৃক্ষে বিজড়িত ভুজঙ্গের নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা উপচিত এই মলয় পবন বসন্তকালে পথিকদিগকে মূর্ছিত করিতেছে।'

বসন্তকালে সুরভি মলয়ানিল প্রোষিত প্রিয়জনের আসঙ্গ-লিপ্সা বর্ধিত করিয়া মানসিক আর্তির কারণ হয়—এই বস্তুটুকুই এখানে বাচ্য। কিন্তু এই বাচ্য বস্তুটি নিবেদিত হইয়াছে একটি কবি কল্পনাসিদ্ধ অর্থের সাহায্যে। বসন্তকালে মলয় পবন যে প্রবাসী প্রণয়ী ব্যক্তিকে মূর্ছিত করে তাহা লৌকিক জগতের অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার নহে; কবির কাব্য জগতেই কেবল এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বাচ্য বস্তুর হেতুরূপে যে বিশেষণটি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে উৎপ্রেক্ষালংকার ধ্বনিত হইতেছে। দক্ষিণবায় মলয় পর্ব্বতের চন্দনবন কম্পিত করিয়া যখন প্রবাহিত

হইয়া আসে তখন উহা চন্দনের সৌরভলুব্ধ ভুজঙ্গগুলির বিষদিগ্ধ নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। দক্ষিণানিলের সেই বিষসম্পর্কই যেন পথিকের মূর্চ্ছার হেতু—এইটিই এখানে ব্যঙ্গ্য উৎপ্রেক্ষার স্বরূপ।

আচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁহার লোচনটীকার মধ্যে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এস্থলে ব্যঙ্গ্য উৎপ্রেক্ষার আরও একটি বিষয় আছে। যেমন পথিকদের মধ্যে একজন মূর্ছিত হইলে অন্যসকলেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তেমনি মলয় পবন নিজে মূর্ছিত হইয়া যেন আর সকলেরও মূর্ছার কারণ হইয়াছে; ঈদৃশ উৎপ্রেক্ষিত অর্থের দ্যোতনাও কবিতাটির মধ্যে আছে। নিম্নে অভিনব গুপ্তের কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'একশ্চ মূচ্ছিতঃ পথিকমধ্যে অন্যেষামপি ধৈর্যচ্যুতিং বিদধৎ মূর্চ্ছাং করোতি—ইতি উভয়থা উৎপ্রেক্ষা।'

—পথিকদের মধ্যে একজন মূর্ছিত হইয়া অন্য সকলেরও ধৈর্যচ্যুতি বিধানপূর্বক মূর্ছা উৎপাদন করে—এইভাবে উভয় দিক্ দিয়াই উৎপ্রেক্ষা আছে।

এখন রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্যগ্রন্থের 'শাজাহান' শীর্ষক কবিতার একস্থলে লিখিয়াছেন—

তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া।"

এই রচনার বাচ্য বস্তু স্পষ্ট। তাজমহলের কালজয়ী সৌন্দর্যদূত যুগ-যুগ ধরিয়া সম্রাটের দাম্পত্য-প্রেমের স্মৃতি নিঃশব্দে প্রিয়ার নিকট বহন করিতেছে—ইহাই এখানে রচনার বাচ্যবস্তু এবং এই বাচ্যবস্তুটি পরিপূর্ণভাবে কবির কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ লৌকিক জগতে কেহ কখনও সৌন্দর্যকে দূত হইয়া বার্তা বহন

করিতে দেখে নাই। কিন্তু কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ ঈদৃশ বাচ্যবস্তু হইতে ব্যঞ্জনা শক্তির মহিমায় একটি ব্যতিরেকালংকার ধ্বনিত হইতেছে যে, তাজমহলের এই সৌন্দর্য দূত লৌকিক দূত অপেক্ষা মহীয়ান্ ও অসাধারণ। প্রেমবার্ত্তাবাহী লৌকিক দূত কখনও বা সতর্ক প্রহরীর দ্বারা ধৃত হইতে পারে; কিন্তু এই সৌন্দর্যরূপী দূত প্রহরীর দ্বারা ধৃত হইবার নহে। লৌকিক দূতের কার্য্য কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ; কিন্তু এই সৌন্দর্যদৌত্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপী। লৌকিক দূত বাক্যময় বার্তা বহন করে—এ দূত নির্বাক, নীরব। সর্বোপরি, লৌকিক দূত প্রেরিত হয় শরীরধারী জীবের উদ্দেশে; কিন্তু এই সৌন্দর্য দূতের যোগ অশরীরী আত্মার সহিত। এইভাবে দেখা যাইতেছে, একের অপেক্ষা অন্যের উৎকর্ষবোধনাত্মক ব্যতিরেকালংকার নানারূপে ধ্বনিত হইয়া রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এখানে বাচ্যবস্তু ততটা সুন্দর নহে—যতটা এই ধ্বন্যমান অলংকার। সুতরাং এটিকে ধ্বনিকাব্যের বিষয়ীভূত মনে করিতে হইবে। এটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনির উদাহরণ।

এইবার কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে বস্তুব্যঞ্জনার বিষয়টি আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ।
মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ॥'

—সেইক্ষণে রাবণের মুকুট হইতে মণির ছলে রাক্ষসশ্রীর অশ্রুবিন্দুগুলি পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল।

শ্রীরামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করিলেন তখন রাবণের রত্নখচিত মুকুট হইতে মণিগুলি চরম অশুভের সূচনা করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কবি বলিতেছেন, সেগুলি তো মণি নহে—রাক্ষসরাজলক্ষ্মীর অশ্রুকণাগুলি মণির আকারে পৃথিবীতে পর্যস্ত হইয়াছিল। এখানে অপহ্নুতি অলংকার বাচ্য হইয়াছে; কারণ প্রকৃতপক্ষে মণিগুলি

ঝরিয়া পড়িলেও তাহার অপলাপ করিয়া তৎস্থলে অশ্রুবিন্দুর আরোপ করা হইয়াছে। আবার রাক্ষসরাজশ্রীর অশ্রুবিন্দু অলীক বলিয়া এখানে অপহ্নুতি অলংকারটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বুঝিতে হইবে। ঈদৃশ বাচ্য অলংকার হইতে একটি বস্তুর ধ্বনি হইতেছে। অদূরভবিষ্যতে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসশ্রীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—এই অর্থটি এখানে ব্যঞ্জনার বিষয়। এই ব্যঞ্জনাগম্য অর্থটি বাচ্য অপহ্নুতি অপেক্ষা সুন্দরতর বলিয়া রচনাটিকে ধ্বনি কাব্য বলা যাইতেছে।

কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে বস্তুধ্বনির আর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

'গাঢ়ালিঙ্গনরভসোদ্যতে দয়িতে লঘু সমপসরতি।
মনস্বিন্যা মানঃ পীড়নভীরুরিব হৃদয়াৎ ॥'

—'প্রিয়তম হর্ষভরে নিবিড় আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে মনস্বিনীর মান পীড়নের ভয়েই যেন হৃদয় হইতে দ্রুত সরিয়া যায়।'

ইহা প্রণয়াপরাধী কোন নায়কের প্রতি কুপিতা নায়িকার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সখীর উক্তি। নায়িকার যাহাতে মান ভঙ্গ হয় সেই জন্য মানবতীদের বৃত্তান্ত সখী বর্ণনা করিতেছেন। এই কবিতাটির মধ্যে উৎপ্রেক্ষালংকার বাচ্য হইয়াছে। মনস্বিনী নারীদের হৃদ্-গত অভিমান আলিঙ্গন-জনিত পীড়নের ভয়েই যেন হৃদয় হইতে দ্রুতগতিতে নিঃশেষে সরিয়া যায়—ইহাই উৎপ্রেক্ষার বিষয়। এই উৎপ্রেক্ষাটি আবার কবি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত : কারণ ভীতিবশে অভিমানের পলায়ন লৌকিক জগতের বস্তু নহে। এইরূপ বাচ্য অলংকার হইতে অন্য একটি বস্তুর ব্যঞ্জনা হইতেছে। যদি মনস্বিনীদেরও মান এতই ক্ষণভঙ্গুর হয় তাহা হইলে তোমাদের মত সামান্যা নারীর যথাকালে অবশ্যই মানভঙ্গ হইবে ; সুতরাং বিলম্ব করিয়া বৃথা আত্মবঞ্চনা করিতেছ—এইরূপ বস্তু এখানে ব্যঞ্জনার বিষয়। এইভাবে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অন্যান্য বাচ্যালংকার হইতেও বস্তুধ্বনি হইতে পারে।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 'সোনার তরী'তে 'প্রতীক্ষা' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এস বরবেশে,
আমার পরাণ বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো ;
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি' দিয়ো।'

কবি তাঁহার কল্পনাশক্তির মহিমায় মৃত্যুকে বররূপে এবং প্রাণকে বধূরূপে দেখিয়াছেন। মৃত্যুর নিকট জীবনের আত্মসমর্পণকে তিনি বরবধূর বিবাহরূপে কল্পনা করিয়াছেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রচনাটির মধ্যে রূপকালংকার বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু এই কবি-কল্পিত বাচ্যালংকার যে অন্য একটি বস্তুর দ্যোতনা করিতেছে তাহা সহৃদয় মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। আমরা অজ্ঞানবশে নিত্য মৃত্যুভীত হইয়া থাকিলেও মৃত্যুই জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে ভয় পান না। তিনি বরং এই অবধারিত পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করেন। মৃত্যু অসম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণতা বিধান করে। যাহা জীর্ণ, পুরাতন, আশাহত তাহাকে মৃত্যু দেয় নব রূপ নূতন প্রেরণা। মৃত্যুই সূচনা করে নূতন জীবনের। ব্যর্থ সাধনার সমস্ত ব্যাকুলতার অবসান ঘটাইয়া এবং নূতন সাধনার অবকাশ দিয়া মৃত্যু সিদ্ধির পথে জীবনকে অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং মৃত্যুর কঠোররূপে প্রাণ ভীত হইলেও উভয়ের মহামিলন জীবের একটি পরম কল্যাণের সূচনা করে। বলা বাহুল্য, এই ধ্বনিত বস্তুটি বাচ্য রূপক-অলংকার অপেক্ষা চারুতর হইয়াছে এবং তাহাই রচনাটির উপাদেয়তার হেতু। তাই কবিতাটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে বস্তুধ্বনির একটি উদাহরণ স্থল।

এখন কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে অলংকার ধ্বনির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

'ধম্মিল্লে নবমল্লিকাসমুদয়ো হস্তে সিতাম্ভোরুহম্
হারঃ কণ্ঠতটে পয়োধরযুগে শ্রীখণ্ডলেপো ঘনঃ।
একোঽপি ত্রিকলিঙ্গ-ভূমি-তিলক! ত্বৎকীর্ত্তিরাশির্যযৌ
নানামণ্ডনতাং পুরন্দরপুরী-বামভ্রুবাং বিগ্রহে॥'

—'হে তৈলঙ্গদেশাধিপ! আপনার কীর্ত্তিরাশি এক হইলেও অমরাবতীর দেবসুন্দরীদের অঙ্গে তাহা বিবিধভূষণরূপে বিরাজিত আছে। তাঁহাদের খোঁপায় ইহা নবমল্লিকাগুচ্ছ, হস্তে শ্বেতপদ্ম, কণ্ঠে হারমালা এবং স্তনদ্বয়ে নিবিড় চন্দনপ্রলেপ।'

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে রূপক অলংকার বাচ্য হইয়াছে। কীর্ত্তিরাশি এবং নবমল্লিকাগুচ্ছ প্রভৃতির মধ্যে অভেদ কল্পনা সেই রূপকের বীজ। কিন্তু এখানে রূপকটি আবার কবি কল্পনাসিদ্ধ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবিগণ হাস্য এবং কীর্তির শুভ্রবর্ণ কল্পনা করিয়া থাকেন; সেই শুভ্রতার সাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া এখানে কীর্তিরাশিতে নবমল্লিকা-গুচ্ছ প্রভৃতি উপমানের আরোপ সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং এখানে রূপকালংকারটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা যে অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা করিতেছে তাহা বিভাবনা নামক অলংকার। 'তুমি পৃথিবীলোকে থাকিয়াও স্বর্গস্থিত দেবগণের উপকার কর'—ইহাই সেই বিভাবনার স্বরূপ। কারণ বিনাই যেখানে কার্য্যোৎপত্তির কথা বলা হয় সেখানে বিভাবনা অলংকার হইয়া থাকে। স্বর্গস্থ দেবগণের উপকার করিতে হইলে স্বর্গস্থিতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু কবিতায় বর্ণিত এই রাজা স্বর্গস্থিতি বিনাই দেবগণের উপকার করিতে সমর্থ। অন্যথা দেবসুন্দরীগণ তাঁহার কীর্তির মালা পরিধান করিতেন না। এইভাবে এখানে বিভাবনা অলংকার ব্যঙ্গ্য হইয়া বাচ্য রূপক অপেক্ষাও চারুতর হইয়াছে; তাই কবিতাটি ধ্বনিকাব্য গোষ্ঠীতে গণ্য হইবার যোগ্য।

এইরূপ অলংকার-ধ্বনির আর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

'যা স্থবিরমিব হসন্তী কবিবদনাম্বুরুহবদ্ধবিনিবেশা।
দর্শয়তি ভুবনমণ্ডলমন্যদিব জয়তি সা বাণী ॥'

—যিনি কবির বদন কমলে উপবেশনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে যেন বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে জগৎ অন্য প্রকারের মত দেখাইয়া থাকেন সেই বাণীর জয় হউক।

রচনাটির মধ্যে কবিকৃতির জয়গান করা হইয়াছে। এখানে 'হসন্তীইব'—'যেন হাসিতে হাসিতে' এবং 'অন্যদ্ইব'—'যেন অন্য রকমের' এই দুই স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বাচ্য হইয়াছে। এই উৎপ্রেক্ষালংকার দুইটি আবার কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ বাণীর হাস্য এবং ভুবনমণ্ডলের অন্যথা প্রকাশ লোকসিদ্ধ বস্তু নহে। ঈদৃশ কবিকল্পিত অলংকার হইতে যে অর্থান্তরের দ্যোতনা হইতেছে তাহা ব্যতিরেক অলংকার। বিধাতার সৃষ্টি অপেক্ষা কবিসৃষ্টির উৎকর্ষ খ্যাপনই সেই ব্যতিরেকের বিষয়। 'যেন হাসিতে হাসিতে' এই প্রথম উৎপ্রেক্ষা হইতে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, বিধাতার সৃষ্টি সুখ দুঃখ এবং মোহের দ্বারা সংকুল। কিন্তু কবিসৃষ্টি 'হ্লাদৈকময়ী'—অবিমিশ্রসুখাত্মিকা। ইহা কোন দিক্ দিয়া দুঃখসম্পৃক্ত নহে। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি অপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ সমধিক। আবার, 'যেন অন্য রকমের'—এই বাচ্য উৎপ্রেক্ষাটি হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, বিধাতার সৃষ্টি কার্যকারণের শৃঙ্খলে নিগড়িত, কিন্তু কবিসৃষ্টি 'নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিতা'; লৌকিক জগতের নিয়ম-কানুনের দ্বারা তাহা শাসিত নহে। কবির নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার দ্বারা সৃষ্ট যে জগৎ তাহার নিত্য নূতন রূপ। কবি ঠিক যেমনটি চাহিবেন বিশ্ব সেইভাবেই পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং কবিজগৎ লৌকিক জগৎ অপেক্ষা বিলক্ষণ। এই ভাবে পূর্বোক্ত দুইটি বাচ্য উৎপ্রেক্ষালংকার হইতে দুইপ্রকার ব্যতিরকোলংকারের ধ্বনি হইতেছে। এই ধ্বনিত ব্যতিরেক বাচ্য

উৎপ্রেক্ষা অপেক্ষা সুন্দরতর বলিয়া রচনাটি ধ্বনিকাব্যের বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

জগন্নাথ তাঁহার রসগঙ্গাধরের মধ্যে এইরূপ অলংকার-ধ্বনির যে উদাহরণটি দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'দয়িতে রদনত্বিষাং মিষাদয়ি তেঽমী বিলসন্তি কেসরাঃ।
অপি চালক-বেষধারিণো মকরন্দস্পৃহয়ালবোঽলয়ঃ॥'

—হে প্রিয়ে! তোমার দন্তদ্যুতির ছলে ওই কেশরগুলি শোভা পাইতেছে। আর মধুলুব্ধ অলিগুলি অলকের বেশ ধারণ করিয়াছে।

ইহা প্রিয়া-প্রসাদন-নিরত কোন নায়কের উক্তি। কবিতাটির মধ্যে দুইটি অপহ্নুতি অলংকার বাচ্য হইয়াছে। 'ইহা তো দন্ত-দ্যুতি নহে—ইহা কেশর' এবং 'এগুলি তো অলক নহে—ইহারা মধুলুব্ধ ভ্রমর' এই উভয় বাক্যের মধ্যেই প্রকৃত দন্ত এবং অলকের অপলাপ করিয়া তৎস্থলে যথাক্রমে অপ্রকৃত কেশর ও ভ্রমরের আরোপ করা হইয়াছে। এই অপহ্নুতি দুইটি আবার কবিকল্পিত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ প্রিয়ার দাঁতের ছটার কেশর হওয়া অথবা অলকের ভ্রমর হওয়া লৌকিক জগতের বস্তু নহে। ইহারা অলৌকিক বলিয়া এস্থলে অপহ্নুতি দুইটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ। কিন্তু তাহা হইতে তৃতীয় একটি অপহ্নুতির ধ্বনি হইতেছে যে, 'তুমি তো নারী নও—তুমি নলিনী'। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, জগন্নাথ কবিপ্রৌঢ়োক্তি এবং কবিনিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তির মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন না! এইভাবে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অন্যান্য অলংকার হইতেও অলংকারান্তরের ধ্বনি হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। কবি তাঁহার 'চিত্রা' কাব্যে 'উর্বশী' শীর্ষক কবিতাটির প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।'

উর্বশী মাতাও নহেন, কন্যাও নহেন, বধূও নহেন—এইরূপ উক্তিতে বিরোধাভাস অলংকার বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বাচ্য অলংকারটিই এখানে কাব্য সৌন্দর্য্যের হেতু নহে। ইহার অন্তরালে যে ব্যতিরেকালংকারের ধ্বনি হইতেছে তাহা রমণীয়তর। লৌকিক জগতে নারী কোন না কোন সম্পর্কে জড়িত, কিন্তু কবির উর্বশী অলৌকিক, অসামান্য—ইহাই এখানে ধ্বনিত ব্যতিরেকালংকারের স্বরূপ। কাব্য সৌন্দর্যের বিচারে এই ধ্বনিগম্য অলংকারটি বাচ্যালংকার অপেক্ষা সুন্দরতর হইয়াছে বলিয়া রচনাটিকে ধ্বনিকাব্য বলিতে হইবে। এটি কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার-ধ্বনির উদাহরণ।

এ পর্যন্ত আমরা কবিকল্পনাসিদ্ধ অর্থকে উপজীব্য করিয়া যে চারিপ্রকার ধ্বনিকাব্যের সম্ভব তাহার আলোচনা করিলাম। এইবার কবিনিবদ্ধ নায়কাদির প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ধ্বনি-ভেদগুলির স্বরূপ বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। তাদৃশ বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'শিখরিণি ক্বনু নাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ।
তরুণি যেন তবাধরপাটলং দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ॥'

—হে তরুণি! ওই শুকশাবক কোন্ পর্বতে কতদিন ধরিয়া কী তপস্যা করিয়াছিল যাহার ফলে তোমার অধরের ন্যায় রক্তবর্ণ বিম্বফলকে দংশন করিতেছে।'

ইহা নায়িকার প্রতি অনুরাগী কোন নায়কের উক্তি। নায়ক এইরূপ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নায়িকার চিত্ত জয় করিতে চাহিতেছেন। বিম্বফলের অধর-পাটলত্ব অথবা শুকশাবকের তপশ্চরণ নায়কের কল্পনাসিদ্ধ বস্তু। ঈদৃশ বস্তু হইতে অন্য একটি বস্তুর ধ্বনি হইতেছে যে, তোমার অধর বহু পুণ্যের ফলে লাভ করা যায়। এইরূপ উক্তি অধরের অসামান্য উপাদেয়তার দ্যোতনা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ বস্তুধ্বনির একটি দৃষ্টান্তনিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে। 'চিত্রা' কাব্যে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটির মধ্যে নায়ক বলিতেছেন,

'দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোন অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো—নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু ; পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর। দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।'

এই কাব্যখণ্ডটির বাচ্যার্থ স্পষ্ট। একটি পরম মধুর পরিবেশের মধ্যে বিশিষ্ট অবস্থায় যখন প্রিয়াপ্রাপ্তি ঘটিবে তখন নায়ক স্বপ্নের মত স্বর্গলোকের কথা মনে করিবেন—ইহাই রচনাটির বাচ্য বস্তু। কিন্তু এই বাচ্য বস্তুর অন্তরালে ব্যঞ্জনাশক্তির মহিমায় অন্য একটি বস্তুর ধ্বনি হইতেছে। স্বর্গের কল্পিত সুখৈশ্বর্য্য যতই প্রলোভনকর হউক না কেন পৃথিবীর স্নেহের নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে মর্ত্তভূমির সহিত আমাদের হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার নিগূঢ় সম্পর্ক—যাহার করুণা ধারায় আমরা নিত্যস্নাত হইয়া জীবন ধারণ ও পোষণ করিতেছি, যে আমাদের অবসাদে রসায়ন, হতাশায় আশ্বাস, সুখে সাহচর্য্য এবং দুঃখে সহানুভূতি দিয়া একান্ত আপনার হইয়া আছে তাহা স্বর্গ অপেক্ষাও লোভনীয় ও সুন্দর। এই বস্তুটি পূর্ব্বোক্ত বাচ্য বস্তু হইতে দ্যোতিত হইতেছে বলিয়া রচনাটি আমাদের এত সুন্দর লাগে। এটি কবি-নিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

এখন নায়কের প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'সুভগে! কোটিসংখ্যত্বমুপেত্যঃ মদনাশুগৈঃ।
বসন্তে পঞ্চতা ত্যক্তা পঞ্চতাসীদ্বিয়োগিনাম্॥'

—হে সুন্দরী! বসন্তকালে মদনের বাণগুলি কোটিসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চতা ত্যাগ করিল, কিন্তু বিয়োগিগণ সেই পঞ্চতা প্রাপ্ত হইল।

মদনের পুষ্পবাণ পাঁচটি হইলেও বসন্তকালে বহু পুষ্পের বিকাশ হেতু তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নিখিলের বিরহিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে—এই অর্থটি কবিতাটির বাচ্যবস্তু। আবার মদনবাণের কোটিসংখ্যাপ্রাপ্তি এবং তাহার দ্বারা নিখিল বিরহীর মরণ—ইহা নায়কের কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈদৃশ বস্তু হইতে একটি উৎপ্রেক্ষালংকার ধ্বনিত হইতেছে যে, পঞ্চত্ব মদনবাণকে ত্যাগ করিয়া যেন বিরহীদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। এইরূপ অলংকার ধ্বনির আর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

'সখি বিরচয্য মানস্য মম ধীরত্বেনাশ্বাসম্।
প্রিয়দর্শনবিশৃঙ্খল-ক্ষণে সহসেতি তেনাপসৃতম্॥'

—'হে সখি! ধৈর্য্য আমার মানের আশ্বাস বিধান করিয়া প্রিয়-দর্শনের ব্যাকুল ক্ষণে সহসা সরিয়া গেল!'

ইহ সখীর প্রতি কোন মানবতী নায়িকার উক্তি। নায়িকা অভিমান ভরে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে প্রিয় সমাগম-কালেও তিনি ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক কঠিনা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যথাসময়ে প্রিয়তমের দর্শন মাত্রেই নিতান্ত ব্যাকুলতা বশে তাঁহার সে ধৈর্য্য থাকে নাই। তাই তিনি সখীকে বলিতেছেন যে, ধৈর্য্য তাঁহার অভিমানের সহায়ক হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই; কারণ যখন ধৈর্য্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল তখন তিনি হঠাৎ অধীরা হইয়া স্বীয় অভিমান ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ স্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,

নায়িকার উক্তিটি তাঁহার কল্পনাসিদ্ধ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। অচেতন ধৈর্য্যের আশ্বাস দান বা অপসরণ লৌকিক জগতের বস্তু নহে। ঈদৃশ বস্তু হইতে তুইটি অলংকার এখানে ধ্বনিত হইতেছে—প্রথমটি বিভাবনা এবং দ্বিতীয়টি উৎপ্রেক্ষা। হেতু বিনা যেখানে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিভাবনার স্থল। এখানে দেখা যাইতেছে, প্রিয়তম প্রার্থনা না করিলেও তাঁহাকে দর্শন করিয়াই নায়িকা প্রসন্না হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রিয়-প্রার্থনারূপ হেতু ব্যতিরেকে এখানে নায়িকার চিত্ত-প্রসাদরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথচ ঠিক এই কথাটি অভিধার দ্বারা উক্ত হয় নাই। তাই কবিতাটির মধ্যে বিভাবনালংকার ধ্বনিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। আবার প্রিয় দর্শনের সুখাবেগ যেন ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করা যায় না। এইরূপে উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিও কবিতাটিতে আছে। এই ধ্বনিত অলংকার তুইটি বাচ্য বস্তু অপেক্ষা সুন্দরতর হইয়াছে বলিয়া রচনাটি ধ্বনি কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য অলংকারও নায়কাদির কল্পনাসিদ্ধ বস্তু হইতে ব্যঙ্গ্য হইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ধ্বনির একটি উদাহরণ-কবিতা নিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে।

জায়েয় বনোদ্দেশে কুব্জইব পাদপোঽঘটিত-পত্রঃ।
মা মানুষে লোকে ত্যাগৈকরসো দরিদ্রশ্চ॥'

—বরং বনগহনে কুব্জ, গলিতপত্র পাদপ হইয়া জন্মগ্রহণ করি। মনুষ্যলোকে ত্যাগপরায়ণ দরিদ্র হইয়া যেন না জন্মাই।'

বক্তা নিজের বিড়ম্বিত দরিদ্রজীবনে বিতৃষ্ণা বোধ করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির মধ্যে বনের গহন প্রদেশে জাত পত্রহীন বৃক্ষের প্রশংসা এবং মনুষ্যসমাজে অবাঞ্ছিত দরিদ্র ব্যক্তির নিন্দা বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বাচ্য বস্তুর অন্তরালে একটি ব্যতিরেকালংকার ধ্বনিত হইয়া রচনাটিকে উত্তম কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মনুষ্যসমাজে ত্যাগ-পরায়ণ দরিদ্র ব্যক্তির জন্ম নিবিড় অরণ্যে গলিতপত্র কুব্জ বৃক্ষের জন্ম অপেক্ষাও শোচনীয়—

ইহাই সেই ধ্বন্যমান ব্যতিরেকের স্বরূপ। বাচ্যার্থবোধের পর এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হওয়াতে রচনাটি আমাদের নিকট সমধিক রমণীয় মনে হয়। তখন অভিধেয়ার্থ গৌণ হইয়া যায়, ব্যঙ্গ্যার্থটিই মুখ্যভাবে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। একটি দৈন্যাহত জীবনের শোচনীয়তা ও ব্যর্থতার কথা আমাদের মনের তন্ত্রীতে বার বার অনুরণিত হইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখানে বাচ্য বস্তু অপেক্ষা ব্যঙ্গ্য অলংকারটিই অধিকতর চমৎকারী। এটি কবিনিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনির উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এইরূপ অলংকার ধ্বনির একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। 'গান্ধারীর আবেদন' শীর্ষক কবিতায় গান্ধারীর উক্তির একস্থলে কবি লিখিয়াছেন,—

'বায়ু হতে বল,
সূর্য্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখ ব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্য-মাঝে গুপ্ত থাকি দীন ছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব; সদা চুপে চুপে
দুঃখ হতে তোমা তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ।'

প্রথমে এই কাব্যখণ্ডটির বাচ্যবস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে বনবাসগামী যুধিষ্ঠিরকে গান্ধারী আশীর্ব্বাদ করিতেছেন —তিনি বায়ু হইতে বল, সূর্য্য হইতে তেজ এবং পৃথিবী হইতে ধৈর্য্য ও ক্ষমা লাভ করুন। এটি গান্ধারীর উক্তির বাচ্য অর্থ এবং ইহা বস্তুমাত্র। কিন্তু এই বাচ্য বস্তু হইতে যে অলংকারের ধ্বনি হইতেছে তাহা উপমা। যুধিষ্ঠির বায়ুর ন্যায় বলবান্, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যবান্ ও ক্ষমাশীল হউন—ইহাই ধ্বনিত উপমার স্বরূপ। বাচ্যার্থের অন্তরালে এইরূপ ব্যঙ্গ্য উপমার প্রতীতিই এখানে কাব্য-সৌন্দর্যের হেতু। অবশ্য এখানে বাচ্য বস্তুর মধ্যে দীপক অলংকারেরও একটু মৃদু স্পর্শ আছে। কারণ 'লাভ কর' এই

একই ক্রিয়ার সহিত বল, তেজ ও ধৈর্য্য ক্ষমার অন্বয় হইয়াছে। কিন্তু দীপকটি এস্থলে এত দুর্বল যে, তাহাকে অনায়াসে বস্তুরূপে গণনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে বক্ত্রীর কল্পনাসিদ্ধ বস্তু হইতে অলংকার ধ্বনি হইতেছে বলা যায়।

এইবার কবিনিবদ্ধ বক্তার কল্পিত অলংকার হইতে বস্তু ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতেছে।

'মল্লিকা-মুকুলে চণ্ডি ! ভাতি গুঞ্জন্ মধুব্রতঃ।
প্রয়াণে পঞ্চবাণস্য শঙ্খমাপূরয়ন্নিব ॥'

—'হে কোপনশীলে! মল্লিকার মুকুলে গুঞ্জন করিতে করিতে মধুকর যেন মদনের বিজয় অভিযানের শঙ্খবাদ্য করিতেছে।'

এখানে অলিগুঞ্জনের স্থলে মদনশঙ্খনাদ উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। এই উৎপ্রেক্ষাটি আবার নায়কের কল্পনাসিদ্ধ। কারণ মদনের বিজয় প্রয়াণে শঙ্খনাদ লৌকিক জগতের বস্তু নহে। কিন্তু ঈদৃশ নায়ক-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ উৎপ্রেক্ষালংকার হইতে একটি বস্তু ধ্বনিত হইতেছে যে,—প্রণয়বাসনার উদ্দীপক বসন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এখনও অভিমান ত্যাগ করিতেছ না কেন? এই ধ্বনিত অর্থবস্তু পূর্ব্বোক্ত বাচ্য অলংকার অপেক্ষা অধিকতর চমৎকারী হইয়াছে বলিয়া রচনাটি ধ্বনি কাব্যের বিষয়। এইরূপ ধ্বনিকাব্যের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'আর্দ্রার্দ্র-করজ-রদনক্ষতৈস্তবলোচনয়োর্মম দত্তম্।
রক্তাংশুকং প্রসাদঃ, কোপেন পুনরিমে নাক্রান্তে ॥'

—'আমার চোখ দুইটি তো ক্রোধাক্রান্ত হয় নাই, তোমার অঙ্গে অভিনব নখক্ষত এবং দন্তক্ষতগুলি আমার নয়ন দুইটিকে রক্তবস্ত্র উপহার দিয়াছে।'

নায়কের দেহে সপত্নীসম্ভোগের চিহ্ন দেখিয়া নায়িকা ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়াছেন। তারপর নায়ক কর্তৃক নয়নরক্তিমার হেতু পৃষ্টা হইয়া কুপিতা নায়িকা এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এই উক্তির মধ্যে দুইটি অলংকার বাচ্য হইয়াছে—একটি উত্তরালংকার এবং

দ্বিতীয়টি অপহ্নুতি। যেখানে প্রশ্নটি অনুক্ত থাকিলেও উত্তরবাক্যের দ্বারা উহা বুঝিয়া লইতে পারা যায় তাহা উত্তরালংকারের স্থল। এস্থলে নায়িকার উত্তরবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি কেন ক্রোধে আরক্ত হইয়াছিল তাহা নায়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ নায়িকা এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে উত্তরালংকার বাচ্য হইয়াছে। আবার এই উত্তরের পরিপোষকরূপে অপহ্নুতি অলংকারও এখানে বাচ্য হইয়াছে। 'ইহা তো কোপরক্তিমা নহে—ইহা সম্ভোগচিহ্ন কর্তৃক উপহৃত রক্তবস্ত্র'—এইটি এখানে অপহ্নুতির স্বরূপ। আবার দেখা যাইতেছে এই উভয় বাচ্য অলংকারই এখানে নায়িকাপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ, কারণ অচেতন বস্তুকর্তৃক অন্য একটি অচেতন বস্তুকে রক্তবস্ত্র উপহার দান—এটি কেবল কল্পনাজগতে সম্ভবপর! কিন্তু ঈদৃশ কল্পনাসিদ্ধ পূর্বোক্ত অলংকার দুইটি হইতে একটি বস্তু ধ্বনিত হইতেছে যে,—'তুমি তোমার দুর্বলতা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি; এবং তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে আমার ক্রোধের হেতু তাহাও তোমার অজ্ঞাত থাকার কথা নহে।' এই পরবর্ত্তী অর্থটিকে ধ্বনিলভ্য বুঝিতে হইবে, কারণ নায়িকার উক্তির মধ্যে ইহা কোথায়ও বাচ্য হয় নাই। এমনি ভাবে কবিনিবদ্ধ-বক্তৃ-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অন্যান্য অলংকার হইতেও বস্তু ধ্বনি হইতে পারে।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথরচিত 'মহুয়া' কাব্যের 'পথের বাঁধন' শীর্ষক কবিতা হইতে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহাতে এইরূপ বস্তু ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।'

এই কাব্যখণ্ডটির মধ্যে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' এইরূপ উক্তিতে বিরোধালংকার বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু রচনার কাব্যসৌন্দর্য্য এই বাচ্যালংকারের উপর নির্ভরশীল নহে। ব্যঞ্জনা-শক্তির বশে ইহা

হইতে যে বস্তু ধ্বনি হইতেছে তাহাই রচনাটিকে সুন্দর করিয়াছে। জীবনের যাত্রা পথে চলিতে চলিতে কখনও কাহারও প্রতি আমাদের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সে অনুরাগ সব সময়ে স্থায়ী হয় না। তাহা ক্রমেই ম্লান হইয়া আসে, হয়তো আমরা অপরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ি। পূর্ব্বের ভালবাসা তখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু তবুও পূর্ব্বানুভূত অনুরাগের মাধুর্য্য আমাদের মগ্ন চেতনায় থাকিয়া মাঝে মাঝে তাহার স্পর্শ দিয়া যায়। প্রেমের এই বৈচিত্র্যরূপ বস্তু এখানে ব্যঞ্জনার বিষয়। কবি বা কবিনিবদ্ধবক্তা নিজের কথায় কোথায়ও ইহা বলেন নাই। যে বিরোধালংকারটি বাচ্য হইয়াছে প্রধানতঃ তাহা হইতেই এই বস্তু ধ্বনির উল্লাস। বিরোধালংকারটিও বক্তার কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এটি কবিনিবদ্ধ-বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

এইবার ঈদৃশ অলংকার হইতে অলংকার ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'মহিলাসহস্র-ভরিতে তব হৃদয়ে সুভগ! সা অমান্তী।
অনুদিনমনন্যকর্মা অঙ্গং তন্বপি তনয়তি॥'

—'হে সুভগ! বহু নারীর দ্বারা ব্যাপ্ত তোমার হৃদয়ে অবকাশ লাভ করিতে না পারিয়া সে নিত্য অনন্যকর্মা হইয়া তাহার কৃশ অঙ্গকে কৃশতর করিতেছে।'

কোন বিরহকৃশা নায়িকার বৃত্তান্ত নায়কের নিকট নিবেদন করিতে গিয়া সখী এই উক্তিটি করিয়াছেন। নায়ক বহুবল্লভ, তাই নায়িকার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নায়িকা তাঁহাকে ভুলেন নাই, তিনি নায়কের চিত্তে একটু স্থান পাইবার জন্য একান্ত অভিলাষিণী, প্রিয়তমের বিরহে তিনি নিত্য কৃশ হইয়া যাইতেছেন।

সখীর এই উক্তির মধ্যে দুইটি হেতু অলংকার বাচ্য হইয়াছে। নায়কের হৃদয় নারীসহস্র ব্যাপ্ত বলিয়া নায়িকা সেখানে প্রবেশের অবকাশ পাইতেছেন না। আবার প্রবেশের অবকাশ পাইতেছেন না-বলিয়া তিনি কৃশ অঙ্গকে কৃশতর করিতেছেন। এইভাবে দুইটি

কার্য্যের দুইটি হেতু সুকৌশলে উক্ত হওয়ায় এখানে হেতু নামক অর্থালংকার আছে। আবার এই হেত্বলংকার এখানে বক্ত্রীর কল্পনাসিদ্ধ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অণুপরিমাণ মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ এবং তজ্জন্য শরীরের কৃশতা বিধান—এই অর্থগুলি নিতান্তই কাল্পনিক। কিন্তু ঈদৃশ হেত্বলংকারের অন্তরালে যে অলংকারান্তরের অভিব্যঞ্জনা হইতেছে তাহা বিশেষোক্তি। কারণ থাকিলেও যেখানে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না তাহা বিশেষোক্তির স্থল। এখানে দেখা যাইতেছে যে, নায়িকা নিজ অঙ্গের কৃশতা বিধান করিয়াও নায়ক হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। প্রবেশ লাভের হেতুটি আছে অথচ কার্য্যটি হইতেছে না। তাই এ স্থলে বিশেষোক্তি অলংকার ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বলিতে হইবে। এই ব্যঙ্গ্য বিশেষোক্তি বাচ্য হেতু অলংকার অপেক্ষা অধিকতর চারু হইয়াছে বলিয়া রচনাটি ধ্বনি কাব্যের বিষয়।

প্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক গ্রন্থ হইতে এইরূপ অলংকার ধ্বনির একটি উদাহরণ নিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে।

'বীরাণাং রমতে ধুস্তৃণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে।
দৃষ্টী রিপুগজকুম্ভস্থলে যথা বহলসিন্দুরে॥'

—বীরগণের দৃষ্টি প্রিয়ার কুংকুমারুণ স্তনতটে ততখানি আনন্দ পায় না যতখানি পায় শত্রুর নিবিড় সিন্দুরলিপ্ত গজকুম্ভস্থলে।'

এটি আসন্ন যুদ্ধগমনোদ্যত কোন বীরের প্রসাধনবতী প্রিয়ার প্রতি বিদায়কালীন আশ্বাস বাণী। ইহার মধ্যে ব্যতিরেক-অলংকার বাচ্য হইয়াছে। প্রিয়াসান্নিধ্য এবং রণপ্রসঙ্গ—এই উভয় বিষয়ে আমাদের যোদ্ধা পুরুষ বদ্ধদৃষ্টি হইলেও প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে তাঁহার ব্যগ্রতা সমধিক—ইহাই উক্তির মধ্যে বাচ্য হইয়াছে। একের অপেক্ষা অন্যের উৎকর্ষ উক্ত হইলে ব্যতিরেক নামক অলংকার হইয়া থাকে। এখানে রচনাটির মধ্যে অভিধাশক্তি সেই ব্যতিরেকালংকারটিকে প্রকাশ করিতেছে, তদতিরিক্ত অন্য কোন প্রতীতি আমরা অভিধা শক্তির দ্বারা পাইতেছি না। অভিধার এইখানেই বিরতি।

কিন্তু বাচ্য ব্যতিরেকালংকার প্রকাশ করিয়া অভিধা বিরত হইয়া গেলেও ব্যঞ্জনা-শক্তির মহিমায় উক্ত ব্যতিরেকের অন্তরালে একটি সুন্দর উপমার প্রতীতি সহৃদয়চিত্তে হয়। প্রেয়সীর স্তনদ্বয় করিকুম্ভের ন্যায় পীনোন্নত—ইহাই সেই ধ্বনিত উপমালংকারের স্বরূপ। যেহেতু এই ধ্বনিগম্য উপমাটি বাচ্য ব্যতিরেক অপেক্ষা চমৎকারী হইয়াছে সেইজন্য রচনাটি ধ্বনিকাব্যের বিষয়ীভূত। এটি কবিনিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার হইতে অলংকারধ্বনির উদাহরণ।

এইরূপ অলংকার ধ্বনির আর একটি দৃষ্টান্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'গিরিরাণী' নামক কবিতায় উমার রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

'শরৎ চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি ফুলের রাশি;
উমার গায়ের আভা দেখি সকাল বেলার রোদে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে।'

এটি গিরিরাজের প্রতি মেনকার উক্তি। বোধনের প্রাক্‌ক্ষণে উমার আসন্ন সমাগম সম্ভাবনায় মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিকট শারদী জ্যোৎস্না উমার হাস্য, শেফালিকার স্পর্শ উমার অঙ্গস্পর্শ এবং নবোদিত রবির অরুণ কিরণ উমারই অঙ্গের আভা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানে রূপক অলংকার বাচ্য হইয়াছে। আবার এই রূপকটি বক্ত্রীর কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে কবিনিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলংকার বলিতে হইবে। কিন্তু এই বাচ্য অলংকারটি বিভাবনা নামক অন্য একটি অলংকারের দ্যোতনা করিতেছে। উমা এক হইলেও গগনে-ভুবনে কুসুমে-জ্যোৎস্নায় তাঁহার অসীম ব্যাপ্তি—ইহাই সেই ধ্বনিত বিভাবনার স্বরূপ। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তির কথা বলা হইলে বিভাবনা অলংকার হইয়া থাকে। এখানে দেখা যাইতেছে,

গিরিরাজকন্যা উমা এক হইয়াও বহু, সীমাবদ্ধ হইয়াও অপরিসীম, অনুপস্থিত হইয়াও দৃশ্যমান। এইভাবে হেতু বিনাই কার্যোৎপত্তির কথা রচনাটির মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং ধ্বন্যমান অলংকারটি বিভাবনা। বলা বাহুল্য, এই ধ্বনিগম্য অলংকারটি বাচ্য রূপক অপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। তাই কাব্যখণ্ডটি ধ্বনিকাব্যের বিষয়ীভূত।

এই ভাবে দেখা গেল, কবিনিবদ্ধ বক্তার প্রৌঢ়োক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিকাব্যের চারি প্রকার ভেদ সম্ভবপর। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বোধ-সৌকর্য্যের অনুরোধে প্রত্যেকটি ভেদের পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলেও শক্তিশালী কবির রচনাতে একাধিক ভেদের সম্মিলিত সমাবেশ প্রায়ই দেখা যাইবে। অলংকারকৌস্তুভ গ্রন্থে কবি কর্ণপূর গোস্বামী তাঁহার গুরু আচার্য্য শ্রীনাথ রচিত এইরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহাই লিখিত হইতেছে—

'শ্রুতিযুগমভিধত্তে শ্রীলবৃন্দাবনেঽসী
ত্বন্নুদিশমিতি নেত্রদ্বন্দ্বমাত্মা হৃদীতি।
ক্বনু ভবসি মহাত্মন্। ব্রূহি কষ্টাসবোঽমী
ত্বদনুসরণ-পান্থাঃ কণ্ঠ এব ভ্রমন্তি॥'

'আমার কর্ণদ্বয় বলে—তুমি শ্রীবৃন্দাবনে থাক, নেত্রদ্বয় বলে—তুমি সর্ব্বদিকে আছ এবং আত্মা বলে—তুমি হৃদয়ে অবস্থান কর। হে মহাত্মন্! তুমি কোথায় থাক তাহা আমায় নিশ্চয় করিয়া বল। আমার এই কঠিন প্রাণ তোমার অনুসরণ ক্রমে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া কণ্ঠে মাত্র অবস্থান করিতেছে।" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বিরহে নিতান্ত ব্যাকুলা ব্রজসুন্দরী এই উক্তিটি করিয়াছেন। তিনি কাণে সকলের মুখেই শুনিতে পান যে শ্রীকৃষ্ণ নাকি বৃন্দাবনে আছেন। কিন্তু চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিলেই দেখিতে পান যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদিকে বর্ত্তমান। আবার বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করেন যে তিনি হৃদয়ে বিরাজিত। তাই ব্যাকুলতা বশে কৃষ্ণানুরাগিণী সুন্দরীর প্রাণ

কণ্ঠাগত হইয়াছে। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতে চাহেন শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে কোথায় আছেন। কবিতাটির বাচ্য অর্থ এই পর্য্যন্তই। এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বক্ত্রীর কল্পনার উপর কবিতাটির বাচ্যার্থ প্রতিষ্ঠিত। কর্ণ বা চক্ষু জড় পদার্থ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান সম্পর্কে পৃষ্ট হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছে, প্রাণ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতেছে—এই অর্থগুলি কাল্পনিক, লৌকিক জগতে ইহারা অনুভবসিদ্ধ নহে। বক্ত্রীর প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এইরূপ বাচ্য অর্থ হইতে যে ধ্বনিগুলির উল্লাস হইতেছে তাহাই এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।

সুন্দরীর কর্ণ, চক্ষু ও বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান সম্পর্কে পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছে তাহা হইতে একটি বস্তুর ধ্বনি হইতেছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি ভিতরে-বাহিরে, দূরে-নিকটে সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন। বিশ্বের সত্তা মাত্রই তাঁহার দ্বারা অনুস্যূত। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—

'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বু অন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥'

—'তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটে। তিনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার তিনি এই সমস্ত জগতের বাহিরে।'

ঈশ্বরের এই সর্ব্বগতত্বরূপ বস্তু ব্রজ সুন্দরীর বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। এটি বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির স্থল।

আবার এখানে বস্তু হইতে অলঙ্কারও ব্যঙ্গ্য হইতেছে। যিনি বৃন্দাবনে তিনি সর্ব্বদিকে আবার তিনিই হৃদয়ে; এইরূপ উক্তির দ্বারা একই ব্যক্তির একই ক্ষণে স্থানত্রয়বৃত্তিরূপ বিরোধের প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং এখানে বিরোধালঙ্কারের ধ্বনি আছে বুঝিতে হইবে। আবার ব্যতিরেক অলঙ্কারও বাচ্যার্থের অন্তরালে দ্যোতিত হইতেছে। 'এইরূপ পুরুষ পুরুষান্তর অপেক্ষা বিলক্ষণ'—এই রূপ অর্থের ব্যঞ্জনা হওয়াতে বুঝিতে হইবে ব্যতিরেকালঙ্কারের

আছে। সুতরাং কবিতাটির প্রথমার্দ্ধে দেখা গেল, বস্তু হইতে বস্তু এবং বস্তু হইতে অলঙ্কার—এই উভয়বিধ ধ্বনিই আছে।

এইবার দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া সেখানে যে ধ্বনি আছে তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। 'হে মহাত্মন্! তুমি কোথায় আছ তাহা আমায় বল'—এইরূপ উক্তির দ্বারা সন্দেহালঙ্কার বাচ্য হইয়াছে। আবার এই সন্দেহালঙ্কার হইতে 'যে হেতু তুমি মহাত্মা সেই হেতু তুমি আমার সন্দেহ-নিবর্ত্তক বাক্য বল ; অন্যথা আমি তোমায় কপটী বলিয়া জানিব'—এইরূপ অর্থের ব্যঞ্জনা হওয়ায় এখানে হেত্বলঙ্কারের ধ্বনি হইতেছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং এস্থলে অলঙ্কার হইতে অলঙ্কার ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে।

আবার পূর্ব্বোক্ত সন্দেহালঙ্কার হইতে ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, 'তুমিই আমাকে তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া বল।' পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। তিনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন সেই ব্যক্তিই কেবল পরম সত্যের সন্ধান পান। উপনিষদের কবি বলিয়াছেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

—'এই আত্মাকে বহুবেদাধ্যয়ন সহায়ে, অথবা ধারণা শক্তির দ্বারা, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।'

তাই ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতেই তাঁহার স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছেন। এখানে অলঙ্কার হইতে বস্তু-ধ্বনি হইতেছে। এইভাবে দেখা গেল, পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে চারি প্রকার

ধ্বনিরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে এবং সেগুলি বক্ত্রীর প্রৌঢ়োক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পর্যন্ত আমরা অর্থশক্তিমূলক ধ্বনির দ্বাদশটি ভেদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। ইতিপূর্ব্বে শব্দশক্তিমূলক ধ্বনিরও দুইটি প্রকার আলোচিত হইয়াছে। এইবার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনির স্বরূপটি বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিধামূলকধ্বনি—৩ উভয়শক্তিমূলক

যে ধ্বনির মূলে শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি উভয়ে ক্রিয়াশীল তাহার নাম উভয়শক্তিমূলক ধ্বনি। ইহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কাব্যখণ্ডটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'অতন্দ্র-চন্দ্রাভরণা সমুদ্দীপিত-মন্মথা।
তারকা-তরলা শ্যামা সানন্দং ন করোতি কম্॥'

—এখানে কবি রাত্রির বর্ণনা করিতেছেন। কবিতাটির মধ্যে যে 'শ্যামা'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার দুইটি অর্থ আছে—রাত্রি এবং নায়িকা-বিশেষ।* প্রথমে এই উভয়পক্ষে কবিতাটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রাত্রিপক্ষে—'প্রস্ফুরিত চন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃতা, মদনের উদ্দীপন-কারিণী, স্বল্পতারকা রজনী কাহাকে আনন্দিত না করে?' নায়িকা পক্ষে—'প্রিয়-প্রার্থনায় আলস্য-রহিতা, চন্দ্র নামক শিরোভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃতা, মদনোদ্দীপন-কারিণী, চঞ্চল-নয়না নায়িকা কাহাকে আনন্দিত না করেন?' এই অর্থদ্বয়ের মধ্যে প্রথম অর্থটি কবিতার বাচ্যার্থ; কারণ প্রকরণ দ্বারা অভিধা ঐ

---

* ১ 'শ্যামা রাত্রির্নিশীথিনী।'
২ 'শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥'

অর্থেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কবি রাত্রির বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং উক্ত প্রসঙ্গের অনুকূল অর্থগুলিই বাচ্যার্থরূপে গৃহীত হইবে। এই বাচ্যার্থবোধের পরও শব্দার্থের মহিমায় যে অর্থান্তরটির প্রতীতি হইতেছে সেটি ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝিতে হইবে। এখানে ব্যঞ্জনাটি কেবল শব্দশক্তি বা কেবল অর্থশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না। উহা উভয়কে আশ্রয় করিয়াই উল্লসিত হইতেছে। চন্দ্র শব্দের দুইটি অর্থ আছে—আকাশের চাঁদ এবং চন্দ্রনামক মাথার অলংকার-বিশেষ। তারকা শব্দও দ্ব্যর্থক—নক্ষত্র এবং চক্ষুর কনীনিকা। তরল শব্দের এক অর্থ বিরল এবং দ্বিতীয় অর্থ চঞ্চল। শ্যামা শব্দ রজনী এবং নায়িকা-বিশেষকে বুঝাইতেছে। এখানে এই শব্দসমূহের প্রথম অর্থগুলি বাচ্যার্থ, কারণ তাহা প্রকরণ-লভ্য; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থগুলি ব্যঙ্গ্যার্থ। যেহেতু এই শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে ইহাদের পর্য্যায়-শব্দ প্রয়োগ করিলেও ব্যঞ্জনা থাকে না, সেই জন্য ইহাদের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা শব্দশক্তি-মূলিকা। আবার অতন্দ্র, আভরণ, সমুদ্দীপিত এবং মন্মথ—এই শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাদের সমার্থক শব্দ দিলে ব্যঙ্গ্যার্থের কোনরূপ হানি হয় না; অতন্দ্র না বলিয়া অনিদ্র বলিলে অথবা আভরণ না বলিয়া ভূষণ বলিলেও ব্যঙ্গ্যার্থটি অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। সুতরাং এই শব্দগুলির স্থলে ব্যঞ্জনা অর্থশক্তি মূলিকা। এই উভয়-শক্তি-মূলিকা ব্যঞ্জনার সম্মিলিত আনুকূল্যে একটি উপমালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে যে, শ্যামা রজনী শ্যামা নায়িকার ন্যায়। এই ধ্বনিগম্য অলঙ্কারটি বাচ্যার্থ অপেক্ষা সুন্দরতর হইয়াছে বলিয়া রচনাটি ধ্বনিকাব্যের বিষয় হইয়াছে।

কবি কর্ণপূরগোস্বামী তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভ গ্রন্থে উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনির যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

'অশেষ-সন্তাপহরো জনুর্ভৃতাম্
সদাবলাকামদমেদুরদ্যুতিঃ।

ত্বিষাঞ্চয়ৈর্মাধব ! জাবন-প্রদো
ভবান্ ভুবং শ্যাময়তে ঘনো নভঃ ॥'

—'দেহধারীদিগের অশেষ দুঃখহারী, সদা ব্রজবধূগণের অভীষ্ট-দায়ক, স্নিগ্ধচ্ছবি, জীবের জীবনপ্রদ হে মাধব ! আপনি আপনার দীপ্তিপুঞ্জের দ্বারা পৃথিবীকে শ্যামল করেন। আর দেহধারী দিগের অশেষ-সন্তাপ-হারী, সদা বলাকার আনন্দ-দায়ক, স্নিগ্ধচ্ছবি, জলদায়ী মেঘ তাহার দীপ্তি সমূহের দ্বারা আকাশকে শ্যামল করে।'

কবিতাটির মধ্যে মাধব এবং মেঘের কার্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থতরাং যে দ্ব্যর্থক বিশেষণগুলি এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাদের উভয় অর্থই বাচ্য বলিতে হইবে। তাদৃশ বাচ্যার্থ হইতে একটি উপমালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে যে, মাধব মেঘের-ন্যায় অথবা মেঘ মাধবের ন্যায়। বলা বাহুল্য, যে ব্যঞ্জনার আনুকূল্যে এই অলঙ্কার-ধ্বনিটি সম্ভবপর হইয়াছে তাহা কেবল শব্দশক্তি বা কেবল অর্থশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না। অর্থাৎ এস্থলে ব্যঞ্জনাটি উভয়শক্তি-মূলিকা। সন্তাপ কথাটির এক অর্থ দুঃখ, দ্বিতীয় অর্থ সম্যক তাপ। মাধব দুঃখ হরণ করেন ; মেঘ নিদাঘের খরতাপ নিবারণ করিয়া থাকে। দেখা যাইতেছে, সন্তাপ কথাটি এখানে পরিবৃত্তিসহ নহে। তেমনি বলাকা এবং জীবন—এই দুইটি শব্দও পরিবর্ত্তন করা চলে না। কারণ এগুলির পরিবর্ত্তনে ব্যঙ্গ্যার্থ টিকে না। স্থতরাং এগুলির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা শব্দশক্তি-মূলিকা। আবার মেচুরদ্যুতি প্রভৃতি শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া সমার্থক স্নিগ্ধচ্ছবি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও ব্যঙ্গ্যার্থের কোন হানি হয় না। তাই বুঝিতে হইবে, এসব ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা অর্থশক্তি-মূলিকা। এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনার সম্মিলিত ফল পূর্ব্বোক্ত উপমালঙ্কার-ধ্বনি।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দশক্তি-মূলক এবং অর্থশক্তি-মূলক—এই দ্বিবিধ ধ্বনি স্বীকারের পরেও উভয়শক্তি মূলক ধ্বনি স্বীকারের আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এই

প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, ধ্বনির এই তৃতীয় ভেদটি অবশ্যই স্বীকার্য্য ; কারণ প্রথম দুইটি ভেদের মধ্যে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আমরা জানি, যে ধ্বনির মুলে পরিবৃত্তিসহ শব্দের প্রাচুর্য্য আছে তাহা অর্থশক্তি-মূলক এবং যেখানে তাহা নাই তাহা শব্দশক্তি-মূলক ; কারণ যেখানে যেটি প্রধান তদনুসারে নামকরণ সমীচীন। কিন্তু যে ধ্বনির ক্ষেত্রে এই উভয় শক্তিরই সাম্য আছে তাদৃশ ধ্বনির নামকরণে কোন্ শক্তি নিয়ামক হইবে ? যদি উহাকে শব্দ-শক্তি-মূলক বলা যায় তাহা হইলে প্রশ্ন আসে, উহা অর্থশক্তি-মূলক নহে কেন ? আবার অর্থশক্তি-মূলক বলিলেও একই সমস্যা থাকিয়া যায়। তাই উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনি স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

এখানে আর একটি শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথম দুইটি ভেদের সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রণ স্বীকার করিলেই তো তৃতীয় ভেদটি গতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এইরূপ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। সঙ্করস্থলে দুইটি পৃথক্ বস্তুর একসঙ্গে মিশ্রণ হইয়া থাকে। এখানে সঙ্কর সম্ভবপর হইত, যদি শব্দশক্তি-মূলক এবং অর্থশক্তি-মূলক এই দ্বিবিধ ধ্বনি হইতে দুইটি বিভিন্ন ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইত। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এস্থলে ব্যঙ্গ্যার্থের ভেদ নাই; শাব্দী এবং আর্থী—এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনার সম্মিলিত ফল হইয়াছ একটি অখণ্ড ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ। সুতরাং উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনি স্থলে সঙ্করের কোন অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে রসগঙ্গাধর গ্রন্থে জগন্নাথ যাহা বলিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

'যে কাব্যে পরিবৃত্তি-সহ এবং পরিবৃত্তি-অসহ শব্দগুলির মধ্যে কোন এক শ্রেণীর শব্দের প্রাচুর্য্য নাই পরন্তু সাম্যই আছে, সেখানে উভয়শক্তি-মুলক ব্যঙ্গ্যার্থ থাকে ; সেইজন্য উভয়শক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনি স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ ধ্বনিকে কেবল শব্দশক্তি-মূলক

বা কেবল অর্থশক্তি-মূলক বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় না, কারণ সেরূপ কোন নিয়ামক হেতু নাই। আবার শব্দশক্তি-মূলক এবং অর্থশক্তি-মূলক ধ্বনির সঙ্করের দ্বারাও ইহাকে গতার্থ করা যায় না, কারণ ব্যঙ্গ্যার্থের ভেদ স্থলেই সঙ্কর অভিপ্রেত। কিন্তু এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ এক বলিয়া সঙ্কর অসম্ভব।'

বস্তুতঃ শব্দশক্তি-মূলক এবং অর্থশক্তি-মূলক এই দ্বিবিধ ধ্বনি হইতে উভয়শক্তি-মূলক ধ্বনির যে পার্থক্যটুকু তাহা ততটা প্রকারগত নহে যতটা পরিমাণগত। কারণ প্রথমোক্ত ধ্বনিদ্বয়ের সম-পরিমাণ স্থিতির উপর তৃতীয় ভেদটি নির্ভরশীল।

এ পর্য্যন্ত আমরা ধ্বনি-কাব্যের সতরটি ভেদের আলোচনা করিলাম। তন্মধ্যে লক্ষণা-মূলক ধ্বনি দুই প্রকার—অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য এবং অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্য। অভিধামূলক ধ্বনির সংলক্ষ্য-ক্রম-ব্যঙ্গ্যবিভাগে শব্দশক্তি-মূলক দুই প্রকার, অর্থশক্তি-মূলক দ্বাদশ প্রকার এবং উভয়শক্তি-মূলক একপ্রকার। এইরূপে সপ্তদশ প্রকার ধ্বনি কাব্যের স্বরূপ উদাহরণ সহকারে বিচার করিয়া দেখা গেল। এইবার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ধ্বনির অষ্টাদশ ভেদ—অসংলক্ষ্য-ক্রম-ব্যঙ্গ্য আলোচিত হইবে। এই ধ্বনি-ভেদটির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ বোধের ক্রমটি এত সূক্ষ্ম এবং দ্রুত-নিষ্পন্ন যে তাহা বোদ্ধার সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য হয় না। মনে হয়, যেন বাচ্যার্থ-বোধের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইতেছে। আলঙ্কারিকগণ ইহারই অপর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—রসধ্বনি। এই রসধ্বনির প্রকার, বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে ধ্বনিবাদের পরিপূর্ণ চিত্রটির পরিচয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইবে। অতএব এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হইবে—রসধ্বনি।

———

রত্নসাগর গ্রন্থমালা